হাদীসে জটিলতা: আমাদের করণীয়

ইসলামের ভিত্তিমূল কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন—সুন্নাহই মুসলিম উম্মাহর রাহবার ও মানদণ্ড। সার্বিক সফলতা ও নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে কুরআন—সুন্নাহ আকড়ে ধরার মাঝেই। রাসূল সা., সাহাবা কেরাম ও সালাফগণ বিভিন্নভাবে এর প্রতি সতর্ক করেছেন। সুতরাং কুরআন—সুন্নাহ যা স্বীকৃতি দিবে তা ইসলাম হবে আর যা স্বীকৃতি দিবে না, তা ইসলাম হবে না। কুরআন—সুন্নাহর বাহিরে না ইসলাম আছে; আর না মুসলমান। তাই প্রতিটি মুসলমানের ঈমান ও আমল হতে হবে কুরআন—সুন্নাহ ভিত্তিক।

জানা কথা, **কুরআন ইসলামের প্রথম উৎস।** সর্বাগ্রে ও সর্বপ্রধান। কুরআন বর্ণিত হয়েছে চূড়ান্ত ও অকাট্ট মাধ্যম দিয়ে। সুতরাং কুরআনের প্রামাণিকতা আলোচনার উর্ধ্বে। তবে কুরআনের সকল নির্দেশনা এক পর্যায়ের নয়, যা কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে। কিছু কিছু আয়াতের নির্দেশনা নির্ণয়ে রয়েছে বিভিন্ন জটিলতা। এমনকি তাতে স্বীকৃত পদ্ধতিতেও মতভিন্নতা হয়েছে। এ বিষয়ে তাফসীর, উলূমুল কুরআন ও উসূলুল ফিকহ বিষয়ক কিতাবে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হলো, হাদীস ও সুন্নাহ। হাদীস শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন যে কোনো ব্যক্তির অজানা নয় যে, 'হাদীস' ও 'সুন্নাহ' বর্ণিত হয়েছে নানাবিধ মাধ্যমে। তাই তার প্রামাণিকতাও এক পর্যায়ের নয়। এতে যেমন রয়েছে পযার্য় ও স্তরভেদ, তেমনি রয়েছে স্বীকৃত মতভেদ। এ ক্ষেত্রে বর্তমান প্রাজ্ঞ সালাফী ও লা—মাযহাবী আলেমগণেরও কোনো দ্বিমত নেই, তারা এমনটিই মনে করে থাকেন।

হাদীস যেহেতু বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমে। আর এই মাধ্যমগুলো কেন্দ্র করেই হাদীসের প্রামাণিকতার মান স্থির হয়ে থাকে তাই সকল হাদীসকে প্রামাণিকতার দিক থেকে এক মনে করা ঠিক হবে না। মাধ্যমগুলো সম্পর্কে সামনে আলোচনা আসছে। আরো একটি স্বীকৃত বাস্তবতা হলো, হাদীসের মাধ্যম ও প্রামাণিকতা নির্ণয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ইজতিহাদের প্রভাব রয়েছে। তাই মুজতাহিদ ব্যতীত সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে ফায়সালা করার অধিকার রাখে না। এবং ইজতিহাদের প্রভাব থাকায় প্রয়োজনে ইমামগণ বিভিন্ন স্থানে মতভেদ করেছেন। ইমাম বুখারী, (২৫৬হি.) ইমাম মুসলিম রাহ. (২৬১হি.) এবং তাঁদের উস্তায ও দাদা উস্তাযগণসহ অন্যান্য ইমাম প্রয়োজনে মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে মতানৈক্য করেছেন। দূর যামানার নয়, হাল যামানার সালাফী আলেমদের আস্থাভাজন শায়খ আলবানী (১৪২০হি.), সাইয়্যেদ সাবেক (১৪২০হি.), শায়খ রাবী মাদখালীসহ অন্যরাও এ ধরণের মতানৈক্য করেছেন।

আর এ মতানৈক্যপূর্ণ হাদীসসমূহের উপরই অনেক আ'মলের ভিত্তি হয়ে থাকে। শাফেঈ মাযহাবের আহকাম সম্বলিত কিতাব 'আততালখীছুল হাবীর' অধ্যয়ন করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বিধান সম্বলিত হাদীসের ক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে কত ইখতিলাফ হয়েছে। এবং বিষয়টি যেমন নাযুক তেমনি জটিল।

যে সকল ভাইয়েরা হাদীস শাস্ত্রকে পানির মত সহজ মনে করেন! তাদের এ বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। তাহলে বুঝে আসবে যে, হাদীস ও হাদীসের উপর আমল মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মতো নয়। বরং এখানে রয়েছে সমূহ জটিলতা ও দুর্বোদ্ধতা।

তাই যে কোনো হাদীস নিয়ে দুই দুই চারের মত বলা যাবে না যে, 'রাবী ছেকাহ। তাই হাদীসও সহীহ! একজনের নিকট সহীহ মানে সকলের নিকট সহীহ!

এমনিভাবে হাদীস প্রমাণ হওয়ার পরই কাজ শেষ হয়ে যায় না। কারণ, সব হাদীসের নির্দেশনা এক পর্যায়ের নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নির্দিষ্ট—সুস্পষ্টভাবে কথা বলেছেন। আবার কখনো অনির্দিষ্ট ও ব্যাপকভাবে বলেছেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রাহ. বলেন:

©والأحكام يبينها ' تارة بصيغة عامة وتارة بصيغة خاصة.®

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হুকুম—আহকাম কখনো ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ দ্বারা কখনো বা নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ব্যাপক ও নির্দিষ্ট উভয়ভাবেই নির্দেশনা দিয়েছেন তাই সর্বক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নির্দেশনার দাবী করা বোকামী বৈ কিছু নয়। জানা কথা যে, ব্যাপক নির্দেশনার অর্থই হলো, একাধিক সম্ভাবনা থাকা। একাধিক সম্ভাব্য নির্দেশনা থেকে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা যেমন জটিল তেমন ইজতিহাদপূর্ণ। একজন মুজতাহিদই সঠিক সমাধান দিতে পারেন। হাদীসের নির্দেশনার জটিলতার প্রতি লক্ষ করে হাদীস ও ফিকহের ইমাম আবূ ইউসূফ রাহ. বলেন:

©ولحديث رسول الله’ معاني ووجوه، وتفسير لا يفهمه ولا يبصره إلا من أعانه الله عليه®

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী অনেক অর্থসমৃদ্ধ, বিভিন্ন দিক ও ব্যাখ্যাপূর্ণ হয়। আল্লাহ তাআলা যাকে যোগ্যতা দান করেন, কেবল সে ব্যক্তি তা হৃদয়াঙ্গম ও তার গভীরে পৌছতে সক্ষম হয়।”

ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট নির্দেশনা নির্ণয় করতে গিয়ে তাদের মাঝে মতানৈক্যও হয়েছে। যা একটি স্বীকৃত বাস্তবতা। যেমন, আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রাহ. সুন্দরই বলেছেন:

©فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثير®

“বহু হাদীস এমন আছে যা বিশুদ্ধ কিন্তু তার অর্থে রয়েছে অনেক মতানৈক্য।”

তাহলে বুঝা গেল, হাদীসের সনদ সহীহ হলেই জটিলতা শেষ হয়ে যায় না। বরং নির্দেশনা জনিত জটিলতা বাকী থেকেই যায়। সুতরাং দু’চোখ বন্ধ করে বলার সুযোগ নেই যে, হাদীস সহীহ, তাই আমল করতেই হবে! হাদীসে এ সকল জটিলতা নিয়ে উলূমুল হাদীস ও উসূলুল ফিকহের কিতাবাদিতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কিতাব অধ্যয়ন করলেই জানা যাবে যে, এ বিষয়ে সমাধানের জন্য রয়েছে বহু নির্দিষ্ট নিয়মনীতি। আর উক্ত নিয়মনীতির আলোকেই সমাধানে পেঁাছুতে হবে। নিয়মনীতির পরোয়া না করা মানেই ফিতনা সৃষ্টি করা, যা পরিত্যাজ্য।

আমাদের বক্ষ্যমাণ কিতাবটির বিষয়ও এ অধ্যায়ের আওতায় পড়ে।

সাধারণ মুসলমান ভাইদের শাস্ত্রীয় বিষয়ে ধারণা না থাকায় কোনো কোনো মহল থেকে বিভিন্নভাবে তাদেরকে প্রভাবিত করা হচ্ছে; ভুল বুঝানো হচ্ছে। তাই তাদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে আমাদের এ প্রয়াস। বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়; প্রয়োজনও নেই। কেউ প্রয়োজনবোধ করলে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে মৌলিক মৌলিক কিছু কথা বোধগম্য করে পেশ করার চেষ্টা করবো। পাঠক মন দিয়ে অধ্যয়ন করলে এ রকম জটিলতম হাদীসের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?— বুঝতে পারবেন বলে আশা রাখি। এর মাধ্যমে অন্যদের প্রোপাগাণ্ডা থেকেও নিরাপদ থাকতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

হাদীস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ সংবাদ

আমরা জানি, হাদীস হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও নির্দেশনা সম্বলিত বিশেষ সংবাদ। আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সরাসরি শুনতে পারিনি; বিভিন্ন মাধ্যমে পেয়েছি তাঁর অমৃত এ বাণী ও নির্দেশনা। সুতরাং হাদীস হলো বর্ণনা নির্ভর দলিল। জানা কথা যে, বর্ণনা নির্ভর দলিলের দালিলিক দিক যথার্থ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট গুণ থাকতে হবে। তাই যে কোনো কথাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও নির্দেশনা দাবী করলেই তা গৃহীত হবেনা। সর্বোপরি বর্ণনা নির্ভর দলিল যথার্থ হওয়ার জন্য দু’টি মাপকাঠিতে সমৃদ্ধ হতে হবে:

- পৌঁছার মাধ্যম (The maner of Transmission)
- নির্দেশনা (Direction)

যেভাবে আমরা কোনো সংবাদ পেলেই চিন্তা করি, এই খবরটি দিলো কে? বা মাধ্যম কী? পরবর্তীর্তে চিন্তা করি, খবরটি দেয়া হলো কেন- কী নির্দেশনা আছে তাতে, ইত্যাদি নিশ্চিত হয়ে আমরা সংবাদটি আমলে নেই।

বলার অপেক্ষা রাখে না, মাধ্যম ও নির্দেশনার দিক থেকে সব খবর এক রকম নয়। কারণ কিছু সংবাদ এমন আছে, যা মানুষের মুখে মুখে ঘুরে ফিরে এবং প্রজন্ম হতে প্রজন্ম পর্যন্ত প্রচারিত ও আলোচিত হতে থাকে। এক জেনারেশন

‘আগত জেনারেশনের’ কাছে পৌঁছিয়ে দেয় মুখে কিংবা কলমে। এ মাধ্যম ব্যাপক ও প্রভাববিস্তারকারী হয়ে থাকে। এ মাধ্যমে কোনো সংবাদ পৌঁছুলে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ থাকে না।

যেমন, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে ১৯৭১ সালে। আমরা যারা এর পরে জন্ম গ্রহণ করেছি তারা ঐ মুহূর্তটি দেখিনি, কিন্তু পূর্ববর্তীরা সংবাদটিকে আমাদের কাছে এমনভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যেনো আমাদের দু’চোখের সামনেই তা ঘটেছে। চাক্ষুষ বস্তুকে যেভাবে অস্বীকার করা যায় না, তদ্রƒপ এই সংবাদটিকেও অস্বীকার করা অসম্ভব। তাই এ মাধ্যমটি অনেক শক্তিশালী ও প্রথম পর্যায়ের।

আবার কিছু সংবাদ আছে এমন, যা আঞ্চলিকভাবে আলোচিত—আলোড়িত ও গৃহীত। যা ঐ অঞ্চলের সচেতন সবাই জানে। ঐ অঞ্চলের লোকেরা বংশপরম্পরায় তা ধারণ ও বহন করে থাকে। আমাদের সকলেরই নিজ এলাকা ভিত্তিক কিছু বর্ণনা বা সংবাদ জানা আছে। এ মাধ্যমটিও অনেক শক্তিশালী, তবে প্রথম মাধ্যমের তুলনায় কম, দ্বিতীয় স্তরের।

প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমে এতোটাই ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি রয়েছে যে, এ মাধ্যমে বর্ণিত সংবাদের প্রতি আমাদের অন্তর আস্থাশীল হয়ে পড়ে; আমরা সহজে তা বিশ্বাস করে নিই।

মাধ্যমটির ব্যাপকতা ও আধিক্যের দরুন তা গ্রহণ বা বর্ণনা করতে আমরা ‘সূত্র’ উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করি না। আর অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভবও নয়। কারণ, বর্ণনাকারী তো হাজার হাজার; কতো জনের নাম বলে বলে বর্ণনা করবো?!!

এছাড়া কিছু সংবাদ এমন রয়েছে, যা কেবলমাত্র একজন সংবাদ দাতার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে।

স্বাভাবিকভাবেই এই মাধ্যমটি প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যম থেকে দুর্বল—নিম্নমানের; তৃতীয় স্তরে গণ্য হবে।

সংবাদপ্রাপ্তির মোটামুটি তিনটি ধরণ আপনাদের কাছে উপস্থাপন করা হলো। নিজেই যাচাই করে নিন, এগুলোর সততার মান কতোটুকু আর কোন্টি শক্তিশালী মাধ্যম!

বলাবাহুল্য, প্রথমটি প্রথম স্তরের, এরপর বাকী দু’টি যথাক্রমেÑ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের। স্তর তিনটিকে আমরা এভাবে বিন্যস্ত করতে পারি:

প্রথম মাধ্যম: প্রজন্ম হতে প্রজন্মের গ্রহণ ও বিবরণ

দ্বিতীয় মাধ্যম: সমষ্টি হতে সমষ্টির গ্রহণ ও বিবরণ

তৃতীয় মাধ্যম: একজন নির্ভরযোগ্য হতে অন্য আরেকজন নির্ভরযোগ্যের গ্রহণ ও বিবরণ

নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে কোনো সংবাদ আমাদের কাছে আসার পর দ্বিতীয় কাজ হলো, সংবাদটির নির্দেশনা উপলব্ধি করা। আমরা জানি, কিছু সংখ্যক সংবাদের নির্দেশনা অধিক পরিস্কার ও স্পষ্ট থাকে যে, শুনামাত্র জনসাধারণ তা বুঝে ফেলে। আবার কিছু সংবাদ আছে এমন, যেগুলোর নির্দেশনা ও মর্মবাণী মুষ্ঠিমেয় শ্রেণী তথা শিক্ষিতসমাজ—বোদ্ধামহলই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন। ঠিক তেমনিভাবে শাস্ত্রীয় কিছু সংবাদ রয়েছে, যা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যতীত অন্যরা বুঝতে পারেন না।

একটি দৈনিক পত্রিকা হাতে নিলেও আমরা বুঝতে পারি যে, পত্রিকাটিতে দেশী—বিদেশী, বানিজ্যিক ও প্রযুক্তির বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশিত হয়। সব সংবাদই কিন্তু সবাই বুঝে উঠতে পারে না। বাংলা ভাষা জানলেই তা বুঝা যায় না। কখনো কখনো সংবাদের মর্ম ও নির্দেশনা স্থির করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

মোটকথা, সকল সংবাদের নির্দেশনা এক পর্যায়ের নয়। প্রত্যেকটি সংবাদের নির্দিষ্ট মর্ম, উদ্দেশ্য ও হেতু থাকে। সংবাদের বর্ণনা কখনো স্পষ্ট হয়, আবার কখনো জটিল হয়। জটিল হলে শুধু বর্ণনার উপর ভর না করে অন্যান্য মাধ্যম—উপকরণের দ্বারা উক্ত বিষয়াদি উদ্ধার করতে হয়। এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞদের মাঝে দ্বিমতও হতে পারে। সাধারণ সংবাদের এই উভয় দিক মনে রাখলে, হাদীসের বিষয়টি বুঝাও আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

হাদীস পৌঁছার মাধ্যম: কিছু জটিলতা

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, হাদীস একটি বর্ণনা নির্ভর দলিল। সুতরাং তার বর্ণনা মাধ্যম অবশ্যই বিবেচ্য থাকবে।

যুগ যুগ ধরে হাদীস ‘কীভাবে’ সংরক্ষিত রয়েছে এবং আমাদের কাছে ‘কীভাবে’ পৌঁছেছেÑ তা নিয়ে ইমামগণ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উসূলে হাদীস গ্রন্থে বিস্তারিত ইতিহাস রয়েছে।

বর্তমান লা—মাযহাবী ও সালাফী ভাইদের শ্রদ্ধাভাজন ইমাম ইবনে হাযম যাহেরী রাহ. এর বক্তব্যের আলোকে আমরা প্রয়োজনীয় আলোচনা তুলে ধরবো ইনশা আল্লাহ।

তিনি দ্বীন তথা কুরআন—হাদীস আমাদের কাছে বর্ণিত হওয়ার মাধ্যম নিয়ে একটি চমৎকার আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছেন। ইবনে হাযম রাহ. (৪৫৬হি.) যা বলেছেন, এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নন, বরং এ কথাগুলো অন্যরাও বলেছেন। সালাফী ভাইদের বুঝার সুবিধার্থে তার বক্তব্যকেই তুলে ধরে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করছি। তবে তার আলোচিত কিছু বিষয়ে কারো কারো আপত্তি থাকতে পারে। এখানে হাদীস বর্ণিত হওয়ার স্বীকৃত প্রথম তিন প্রকার নিয়ে আলোচনা করছি। তিনি তিন প্রকারকে গ্রহণযোগ্য স্থির করেছেন।

এক. প্রজন্ম হতে প্রজন্মের গ্রহণ ও বিবরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে নামায শিখিয়েছেন। সাহাবা কেরাম রা. প্রথম প্রজন্ম। তারা দ্বিতীয় প্রজন্মকে শিখিয়েছেন। তারা তাবেঈ। তাবেঈগণ পরবতীর্ প্রজন্মÑ তাবেঈ—তাবেঈদের শিখিয়েছেন। এভাবে নামায প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে আমাদের কাছে অবিচ্ছিন্ন ধারায় পৌঁছেছে।

কুরআন কারীমসহ ইসলামের অনেক বিধান আমাদের নিকট ‘একক সনদের’ মাধ্যমে আসেনি। বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের গ্রহণ ও বিবরণের মাধ্যমে এসেছে। এটাই হলো হাদীস বর্ণিত হওয়ার প্রথম মাধ্যম। ইবনে হাযম রাহ. (৪৫৬হি.) প্রথম মাধ্যমের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন:

أولها : شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا جيلا لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف غير معاند للمشاهد وهو القرآن المكتوب في المصاحف في شرق الأرض وغربها لا يشكون ولا يختلفون في أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أتي به وأخبر أن الله عز وجل أوحى به إليه وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك ثم أخذ عن أولئك حتى بلغ إلينا.

ومن ذلك الصلوات الخمس وكصيام شهر رمضان وكالحج .

“প্রথমটি হলো, পূর্ব—পশ্চিমের সকল ব্যক্তিবর্গ বংশ পরম্পরায় যা বর্ণনা করে থাকে। কোনো মুমিন ও বাস্তবতায় বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান কাফিরও এর সত্যতার প্রতি আপত্তি উত্তোলন করে না। আর তা হলো, কুরআনুল কারীম। যা পৃথিবীর পূর্ব—পশ্চিমে সকলের নিকট ‘মুসহাফে’ সংরক্ষিত।

এতে কারো দ্বিধা নেই, এটি আরবের মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহর উপর আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন। তারপর তাঁর অনূসারীগণ তার থেকে গ্রহণ করেছেন। পরাক্রমে তা আমাদের পর্যন্ত এসে পেঁৗছেছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রামাযানের রোযা ও হজ্বও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।”

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইবনে হাযম রাহ. (৪৫৬হি.) যা বলেছেন, তা তার একক বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত নয়। যুগে যুগে ইমামগণ এমনটি বলেছেন। অনেকেই বক্তব্যে তা উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেঈ রাহ. এ মাধ্যমটির আলোচনা এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

والخبر عنه خبران :

خبر جماعة عن جماعة عن رسول الله ، يحمل ما فرض الله سبحانه على العباد أن يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم، ويؤتوه من أنفسهم وأموالهم، وهذا ما لا يسع جهله، وما يكاد أهل العلم والعوام أن يستووا فيه، لأن كلا كلفه، كعدد الصلاة وتحريم الفواحش وإن لله حقا عليهم في أموالهم وما كان في معنى.

وخبر خاصة في خاص الأحكام لم يأت اكثره كما جاء الأول.

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত ‘বর্ণনা’ সমুহ দু’ধরণের।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জামাতওয়ারি সূত্রে এমন ফরয আহকামসমুহ বর্ণিত হওয়া যার তামীল করা বান্দার উপর মৌখিক ও প্রায়োগিক উভয়ভাবেই আবশ্যকীয়। এবং নিজের জান—মাল খরচ করে যা পালন করা

কর্তব্য। এ ধরণের বিধান সম্পর্কে সকলের ইলম থাকা জরুরী। আহলে ইলম জনসাধারণ সকলেই এতে বরাবর। কারণ, এখানে প্রত্যেকে আদিষ্ট ও বাধ্য। যেমন, নামাযের সংখ্যা, ফাহেশা কাজ নিষিদ্ধ হওয়া, বান্দার মালের উপর আল্লাহ তাআলার হক থাকা, এ ধরণের ইত্যাকার বিষয়াবলি।

আর বিশেষ ব্যক্তিদের বিশেষ হুকুম সংক্রান্ত বর্ণনা, প্রথমটির ন্যায় এত অধিক পরিমাণ মানুষ বর্ণনা করে না।"

নিকটাতীত ইমামদের মাঝে আল্লামা আন্ওয়ার শাহ কাশ্মিরী রাহ. (১৩৫৩হি.) বিভিন্নভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর শাগরিদ শায়খুল হাদীস আল্লামা ইউসূফ বানূরী রাহ. (১৩৯৭হি.) তাঁর ব্যাখ্যাটিকে এভাবে তুলে ধরেছেন:

تواتر الطبقة، كتواتر القرآن، تواتر على البسيطة شرقا وغربا درسا وتلاوة حفظا وقراءة، وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة، اقرأ إلى حضرة الرسالة، ولا تحتاج إلى إسناد يكون عن فلان عن فلان، وهذا تواتر القرآن المجيد® كيف تواتر علىۣ نيل الفرقدين®: وهذاۣ الفقهاء —في أكثر مصطلحاتهم—. وقال الشيخ في وجه البسيطة عند المسلمين تواتر طبقة بعد طبقة بحيث لا يوجد أحد منهم لا يعلم أن كتابا سماويا نزل على النبي ' وأنه بأيدينا، ومع هذا لو طلبنا تواتر إسناد كل آية منه لأعوزنا ذلك الأمر وعجزنا أهـ.

"তাওয়াতুরে তাবাকা। যেমন, কুরআন তাওয়াতুর সূত্রে বর্ণিত। পৃথিবীর পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত তেলাওয়াত, দরস, মুখস্থকরণ, পড়া সবগুলো পন্থায় ছড়িয়ে পড়েছে। সমষ্টি থেকে সমষ্টি তা তালাক্কী করেছে। যেমন, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পড়লে, তাহলে আর কোনো 'অমুক বর্ণনা করেছে অমুক থেকে' ইত্যাকার বিষয় থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলে। ফুকাহা কেরাম পারিভাষিকভাবে তাওয়াতুর দ্বারা অধিকাংশ সময় এটিকে উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। শায়খ (কাশ্মিরী রাহ.) নায়লুল ফারকাদাইনে বলেছেন, এই যে 'কুরআন মাজীদ' কিভাবে মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকতার সাথে এক তাবাকা থেকে অপর তাবাকা পর্যন্ত পৌঁছল, এমনকি এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যার জানা নেই যে, একটি আসমানী কিতাব আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে, এবং তা আমাদের হাতে আছে। তা সত্ত্বেও যদি আমরা প্রত্যেকটি আয়াতের জন্য সনদগত দিক থেকে তাওয়াতুর অনুসন্ধান করি, তাহলে আমরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরবো।"

এই মাধ্যমটি উসূলিয়্যীন ইমামদের নিকট খুবই পরিচিত। তারাই এ মাধ্যম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকেন। এ মাধ্যম বুঝানোর জন্য তারা সাধারণত 'তাওয়াতুর' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন।

প্রথম মাধ্যমটির মান

মাধ্যমটির আলোচনা থেকেই বুঝতে পারছি, এটি সবার্ধিক শক্তিশালী মাধ্যম। এ মাধ্যমে বর্ণিত কোনো হাদীসকে 'মুতাওয়াতির' বললেই যথেষ্ট। 'সহীহ' বলার প্রয়োজন হয় না। ইমাম শাফেঈ রাহ. এ মাধ্যমে বর্ণিত সুন্নাহ সম্পর্কে বলেন:

® الإجماع أكبر من الخبر المنفردۣ

"একক সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে 'ইজমা' (অর্থাৎ প্রথম মাধ্যমে বর্ণিত সুন্নাহ) অধিক বড় ও শক্তিশালী।"

ইমাম শাফেঈ রাহ. (২০৪হি.) এর বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমেয় যে, এ মাধ্যম সর্বাধিক উত্তম। এবং এ মাধ্যমে প্রমাণিত বিধান একক সনদে বর্ণিত বিপরীত বিধানের উপর প্রাধান্য পাবে।

এ মাধ্যমে কোনো হাদীস আমাদের কাছে পৌঁছুলেÑ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ থাকে না।

আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি, হাদীস 'এক বা দু'জনের' মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছুয়নি, বরং বর্ণনাকারী অসংখ্য। এবং নির্ভরযোগ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে। সুতরাং কোনো হাদীস এ মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ার পরওÑ দাবী করা যে, নাÑআমরা মানি না, আমাদেরকে 'একক' ব্যক্তির বর্ণনা ও সনদ দেখাতে হবেÑ কেবল অবুঝের প্রলাপ বৈ কিছু নয়!

যেমন, কুরআন আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে। অথচ কোনো একক বর্ণনা নেই। এমনিভাবে জানাযার নামাযের শুরুতে হাত উঠানো (সালাফী ও লা—মাযহাবীরাও উঠিয়ে থাকে)। অথচ এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'সহীহ' 'সরীহ' কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি হাত না উঠাতেন। তাহলে

এ আমল সকল মুসলমান কোথায় পেলো? তাদের মাঝে এতো ব্যাপক পরিমাণে প্রচলিত হলোই বা কিভাবে? স্বাভাবিক কথা যে, নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তারা পেয়েছেন। তাই হাত উঠানো প্রথম মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ার কারণে সকলেই তা গ্রহণ করে আমলে নিয়েছেন। এমনিভাবে কিছু ব্যাখ্যাসহ বলা যায় যে, জানাযার নামাযে রুকূ—সেজদা নেই। অথচ রুকূ—সেজদা করতে বারণ করা হয়েছেÑ এমন কোনো সহীহ হাদীসও নেই। আমরা রুকূ—সেজদা থেকে বিরত থাকি? কারণ, এ বিধানটি আমাদের কাছে এভাবেই প্রথম মাধ্যম তথা প্রজন্ম হতে প্রজন্মের গ্রহণ ও বিবরণ এর মাধ্যমে পৌঁছেছে, এটাই যথেষ্ট।

একক ব্যক্তির প্রয়োজন নেই; বরং এটা তার উর্ধ্বে। এরপরও কেউ যদি বলেÑ না, মানি না! তাহলে তার এই দাবির জবাব দেয়ার আর উপযুক্ত থাকে না। অনেকটা সূর্য মধ্যাকাশে থাকা সত্ত্বেও বাতি জ্বালানোর দাবী করার মতো!!!

আমাদের কাছে একক বর্ণনা নেইÑ এর অর্থ এটা নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বলেননি’। না বললে প্রথম মাধ্যমে বর্ণিত হলো কীভাবে? বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; নির্দেশনাও দিয়েছেন। তবে নির্দেশনা এতো প্রসিদ্ধ ও আলোচিত হয়েছেÑ একক বর্ণনার প্রয়োজন আর বাকী থাকেনি, পরবর্তীতে একক বর্ণনার গুরুত্বও দেয়া হয়নি। তাই এ বিধানগুলোর ‘সনদ’ কখনো আমাদের কাছে পেঁৗছেছে; কখনো বা পেঁৗছেনি।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রাহ. বলেন:

®لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول؛ أو بإسناد منقطع؛ أو لا يبلغنا بالكلية

“কারণ, এমন হাদীস রয়েছে, যা তাঁদের নিকট সহীহ সূত্রে বিদ্যমান ছিলো, কিন্তু আমাদের নিকট তা শুধু মাজহুল বা মুনকাতি সূত্রে পেঁৗছেছে। কিংবা একেবারেই পেঁৗছেনি।”

আমাদের ক্ষেত্রেই ভেবে দেখুন, নিজেদের মাঝে প্রসিদ্ধ ও ব্যাপক আলোচিত বিষয়ের অবতারণা করলেÑ আমরা সূত্র ও উদ্ধৃতির উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করি না।

হাদীস আমল ও তালাক্কীর মাধ্যমে গৃহিত হলে সনদের গুরুত্ব শিথিল হয়ে যাওয়া মুহাদ্দিসীনগণের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ বিষয়। এখানে দু’একটি ‘নস’ উল্লেখ করছি। শাফেঈ মাযহাবের ইমাম আবু বকর খতীব বাগদাদী রাহ. (৪৬৩হি.) একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন:

®وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد ، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة ، غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها®.

“এ হাদীসগুলো যদিও (নিছক) সনদের বিচারে শক্তিশালী নয়। তবে যেহেতু এগুলো পরবর্তর্ীদের এক বিশাল জামাত পূর্ববর্তীদের এক বিশাল জামাত থেকে ‘তালাক্কী’ বা গ্রহণ করেছেন। যা তাদের নিকট হাদীসগুলো প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই তারা সনদের পিছনে পড়ার তেমন প্রয়োজন বোধ করেননি।”

মালেকী মাযহাবের ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৪৬৩হি.) এ ধরণের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন:

®هو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الإسناد ، لشهرته عندهم.

“এ হাদীসটি আহলে ইলমগণের নিকট এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, এর সনদ বর্ণনা করার তেমন প্রয়োজন নেই।”

তিনি অন্য আরেকটি হাদীস সম্পর্কে বলেন:

®وهذا الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك ، وهو عند جماعة العلماء أصل تلقوه بالقبول ، وبنوا عليه كثيرا من فروعه ، واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد ، كما اشتهر عندهم لا وصية لوارث ®. ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة ®: قول عليه السلام يكاد يستغنى فيها عن الإسناد®.

“ইমাম মালেক রাহ. এর ভাষ্যমতে ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত এ হাদীসটি ‘মাহফুয’। এবং তা উলামা কেরামের নিকট একটি স্বীকৃত মুলনীতি। এ মুলনীতির উপর ভিত্তি করে তারা অনেক ‘ফুরুয়ী’ মাসাইল উদ্ঘাটন করেছেন। এবং হাদীসটি হিজায ও ইরাকের আহলে ইলমের নিকট ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যার ফলশ্রুতিতে এর সনদ বর্ণনা

করার তেমন প্রয়োজন বোধ হয়নি। যেমনটি প্রসিদ্ধ লাভ করেছে 'لا وصية لوارث' হাদীসটি। এ ধরণের সমস্ত হাদীস যা উলামাদের নিকট খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে সনদের পিছনে পড়ার তেমন প্রয়োজন নেই।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি সম্বলিত হযরত আমর ইবনে হাযম এর হাদীস সম্পর্কে তিনি বলেন:

هذا كتاب مشهور عند أهل السير ، ومعروف عند أهل العلم ، معروف يستغني بشهرتها عن الإسناد.®

" ইতিহাসবেত্তা ও আহলে ইলমগণের নিকট তা একটি প্রসিদ্ধ চিঠি। এর ছুবুত প্রমাণ করার জন্য সনদ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।"

তিনি আরো বলেন:

وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل ، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل ، وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر®

"আমর ইবনে হাযম রা. এর এই চিঠিকে আহলে ইলমগণ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে এর উপর আমল করেছেন। আর তাদের নিকট 'তালাক্কী'র মাধ্যমে গ্রহণ করা একক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার চে' অধিক শক্তিশালী। এবং ফতোয়া প্রদানকারী ফুকাহা কেরাম ও তাদের শিষ্যগণ এ বিষয়ে একমত যে, পবিত্রতা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা যাবে না।"

ইমাম মালেক রাহ. (১৭৯হি.) আরো ব্যাপকভাবে বলেছেন:

شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده.®

"মদীনায় কোনো হাদীস ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করাই তার সনদের বিশুদ্ধতা যাচাই করার প্রয়োজন নাই।"

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রাহ. (৭৯৫হি.) এ বিষয়ে একটি উদাহরণ উল্লেখ করে মৌলিক সুন্দর নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

اتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم، وعمل المسلمين عليهِ.

وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ ‘، بل يكتفى بالعمل به.

"উলামাগণের সর্বসম্মতি হলো, আইয়্যামে তাশরীকে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক দিতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সহীহ মারফূ কোনো বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে না। বরং সাহাবা কেরাম রা. ও পরবর্তীদের থেকে আছার ও মুসলমানদের আমল পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এটি এ নির্দেশনা প্রদান করে যে, কোনো বিষয়ে সরাসরি স্পষ্টভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু বর্ণনা না পাওয়া গেলে উম্মাহর ইজমা এ ক্ষেত্রে আমলের জন্য যথেষ্ট।"

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রাহ. (৭৯৫হি.) এর সমর্থনÑ ইমাম বুখারী রাহ.—সহ অন্যান্য সালাফ ও ইমাম থেকে পাওয়া যায়।

এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, প্রসিদ্ধ হাদীসের ক্ষেত্রে সনদ বর্ণনা করার শিথিলতা সালাফের যামানাতেই ছিলো। অনেক ইমাম সনদ জানা থাকার পরও হাদীসের প্রসিদ্ধি ও রাবীর আধিক্যতার দরুন সনদ বর্ণনা করতেন না। যেমন, ইবরাহীম নাখায়ী রাহ., হাসান বসরী রাহ. সহ প্রমুখ ইমাম। এ সংক্রান্ত সমস্ত প্রমাণাদি একত্রিত করলে স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ নিবে। তবে এখানে এতটুকুই যথেষ্ট।

সর্বোপরি আমরা জানলাম, হাদীস আমাদের কাছে পৌঁছার যত মাধ্যম আছে, তার মাঝে সর্বোত্তম ও সবচে' শক্তিশালী মাধ্যম হলো প্রথম মাধ্যমÑ প্রজন্ম হতে প্রজন্মের গ্রহণ ও বিবরণ। এটাও জানলাম, এ মাধ্যমের আলোচনা আজ নতুন কিছু নয়, বরং প্রতিটি যুগেই এ মাধ্যমটি স্বীকৃত ছিলো।

দ্বিতীয় মাধ্যম: সমষ্টি থেকে সমষ্টির গ্রহণ ও বিবরণ

এ মাধ্যমের সরল ব্যাখ্যা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নির্দেশনা দিলেন সাহাবা কেরামের মাঝে। তাদের থেকে তাবেঈদের এক জামাত বা সমষ্টি তা জেনেছেন, তারা পরবতীর্ জামাত বা সমষ্টিকে বর্ণনা দিয়েছেনÑ এভাবে পরবর্তীদের কাছে এসে পৌঁছেছে। ইবনে হাযম রাহ. (৪৫৬হি.) এ মাধ্যমের আলোচনা এভাবে করেছেন:

والثاني : شيئ نقلته الكافة عن مثلها حتى يبلغ الأمر كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ككثير من آياته ومعجزاته التي ظهرت يوم الخندق وفي تبوك بحضرة الجيش وككثير من مناسك الحج وكزكاة التمر والبر والشعير والورق والإبل والذهب والبقر والغنم ومعاملته أهل خيبر وغير ذلك مما يخفى على العامة وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط.

"দ্বিতীয় প্রকার: কোনো বিষয় বড় এক জামাত অপর এক বড় জামাত থেকে বর্ণনা করেছে, এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক অলৌকিক নিদর্শন ও মুজিযা যা খন্দক যুদ্ধে, তাবুক যুদ্ধে সৈন্য বাহিনীর মাঝে প্রকাশ পেয়েছিলো। এমনিভাবে হজ্বের আহকাম, এবং খেজুর, গম, যব, স্বর্ণ, রুপা, উট, গরু, বকরির যাকাত। খায়বারবাসীদের সাথে বর্গা চাষ ইত্যাদি যা সর্বসাধারণের নিকট অজানা। যা কেবল আহলে ইলমগণ জানেন।"

এ মাধ্যমটির আলোচনাও স্বতন্ত্রভাবে ইবনে হাযম রাহ. (৪৫৬হি.) এর একার নয়, বরং যুগ যুগ ধরে ইমামগণ করে আসছেন।

উসূলিয়্যীনগণ সাধারণত এই মাধ্যমকে 'মাশহুর' বা 'মুসতাফীয' বা 'মারুফ' বলে থাকেন। অনেক ইমাম এই মাধ্যমকে 'সুন্নাহ' ও 'আমল' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এখানে ইবনে হাযম রাহ. (৪৫৬হি.) সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। মুলত এ মাধ্যমের একাধিক প্রকার ও ধরণ হতে পারে। ইমাম আবদুল কাহের বাগদাদী রাহ.(৪২৯) 'উসূলুদ্দীন' কিতাবে আরো বিশদাকারে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন:

الأخبار عندنا على ثلاثة أقسام : تواتر، وآحاد ومتوسط بينهما مستفيض جار مجرى التواتر في بعض أحكامه...

وأما المتوسط بين التواتر والآحاد فإنه شارك التواتر في إيجابه للعلم والعمل، ويفارقه من حيث أن العلم الواقع عنه يكون مكتسبا والعلم الواقع عن التواتر ضروري غير مكتسب.

وهذا النوع المستفيض المتوسط بين التواتر والآحاد على أقسام :

أحدها : خبر من دلت المعجزة على صدقه كأخبار الأنبياء عليهم السلام

والثاني : خبر من أخبر عن صدقه صاحب معجزة.

والثالث : خبر رواه في الأصل قوم ثقات ثم انتشر بعدهم رواته في الأعصار حتى بلغوا حد التواتر،[وإن كانوا في العصر الأول محصورين، ومن هذا الجنس أخبار الرؤية] كالأخبار في الرؤية والشفاعة والحوض والميزان والرجم والمسح على الخفين وعذاب القبر ونحوه.

والقسم الرابع منه : خبر من أخبار الآحاد في [الأحكام الشريعة] كل عصره قد أجمعت الأمة على الحكم به؛ كالخبر في أن ® لا تنكح المرأة® على عمتها ولا على خالتها® وفي أن السارق ® لا وصية لوارث® وفي أن لما دون النصاب ومن غير حرز لا يقطع. ولا اعتبار في مثل هذا بخلاف أهل الأهواء من الروافض والقدرية والخوارج والجهمية والنجارية؛ لأن أهل الأهواء لا اعتبار بخلافهم في أحكام الفقه وإن اعتبرنا خلافهم في أبواب علم الكلام [وكل أنواع هذا المستفيض موجب للعمل والعلم المكتسب].

"আমাদের নিকট 'খবার' তিন প্রকার:

১. তাওয়াতুর

২. আহাদ

৩. উভয়টির মধ্যবর্তর্ী, মুস্তাফীয। যা কিছু আহকামের ক্ষেত্রে তাওয়াতুরের স্থলাভিষিক্ত।

তৃতীয় প্রকারটি তাওয়াতুরের সাথে ইলম ও আমল ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে সামঞ্জস্য রাখে। তবে তাওয়াতুর দ্বারা যেই ইলম হাসিল হয় তা হয় অবশ্যম্ভাবী, আর 'মুতাওয়াসসিত' দ্বারা ইলমে কাসবী হাসিল হয়।

এই তৃতীয় প্রকারটি আবার কয়েক প্রকারে বিভক্ত।

১. যে ব্যক্তির খবারের সত্যতা মুজিযার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কতৃর্ক খবার।

২. যে ব্যক্তির খবারের সত্যায়ন নবীগণ করেছেন।

৩. এমন খবার যা মূলত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের এক জামাত বর্ণনা করেছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন যামানায় বর্ণনাকারীগণ এর ব্যাপকতার কারণে তাওয়াতুরের পর্যায়ে পেঁৗছে গিয়েছে। যেমন, আল্লাহর দর্শন, শাফাআত, হাউযে কাউসার, মীযান, রজম, চামড়ার মৌজার উপর মাসেহ, কবরের আযাব ইত্যাদি।

৪. এমন খবার যা সর্বকালেই খবারে ওয়াহিদ হিসেবে ছিলো। উলামা কেরাম একমত যে, এর দ্বারা শরয়ী আহকাম ছাবেত হবে। যেমন, ওয়ারিসের জন্য অসিয়্যাত জায়েয না হওয়া, কোনো মহিলাকে তার ফুফু বা খালার সাথে একত্রে বিবাহ প্রদান বৈধ না হওয়া, নিসাব থেকে কম মূল্যের বা অরক্ষিত সম্পদ চুরির কারণে হাত না কাটা ইত্যাদি। আর এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি পুজারী রাফেযী, খারেজী, কাদরিয়া, জাহমিয়া, নাজ্জারিয়াদের ইখতিলাফের কোনো ধর্তব্য হবে না। কেননা, ফিকহী বিষয়ে তাদের ইখতিলাফের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যদিও ইলমে কালামের মাঝে তাদের ইখতিলাফকে ইখতিলাফ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। (খবারে মুসতাফীযের প্রত্যেক প্রকার দ্বারা আমল ওয়াজিব হয়, তবে তা থেকে অর্জিত ইলমটি ইলমে কাসবী হয়)"

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ.ও এ মাধ্যমকে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। তিনি মদীনার আমল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

أن اجماع أهل المدينة على أربع مراتب :

الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبى ، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضروات والأحباس فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء ... .

"আহলে মদীনার ইজমা চার প্রকার।

এক. যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনার মত। যেমন, মুদ,সা'র পরিমাণ সম্পর্কিত তাদের বর্ণনা। এমনিভাবে শস্য—সবজি যাকাত না করা সম্পর্কে বর্ণনা। যা সকল উলামা কেরামের মতে প্রমাণযোগ্য।"

এখানে সহজেই অনুমেয়, আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রাহ. মদীনার এ প্রকার আমলকে হাদীস ও সুন্নাহ বর্ণিত হওয়ার মাধ্যম বলেছেন। এবং তিনি এটাও বলেছেন, এ মাধ্যম সর্বজন স্বীকৃত। সবাই এটাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী রাহ. 'মুদের' হাদীস তাঁর 'সহীহ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন; যা এই মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, ইমাম বুখারী রাহ.ও এ মাধ্যমকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী রাহ. এর নিকট এ মাধ্যমটির গুরুত্ব তাঁর 'সহীহ' কিতাবের নিম্নের শিরোনাম থেকে প্রতীয়মান হয়।

®ما ذكر النبي ، وحض على إنفاق أهل العلم وما أجمع عليه عليه الحرمان مكة و مدينة

"এ পরিচ্ছেদটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃর্ক আহলে ইলমগণকে একতাবদ্ধ হওয়া ও মক্কা—মদীনাবাসী যে বিষয়ের উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন এর প্রতি উদ্ধুদ্ধকরণ প্রসঙ্গে।"

এছাড়া আরো অনেক স্থানে তিনিও 'তালাক্কীর' গুরুত্ব দিয়েছেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রাহ. যা বলেছেন তা শুধু মদীনার জন্যই নির্ধারিত নয়। বরং প্রত্যেক ঐ অঞ্চল যেখানে সাহাবা গিয়েছেন; অবস্থান করেছেন। দীনের তালীম দিয়েছেন সে ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ইমাম বুখারী রাহ. মক্কার কথা তিনি শিরোনামেই উল্লেখ করেছেন। কূফাও এর অন্যতম। কারণ, এখানে পনেরশ' সাহাবা অবস্থান করেছেন। চতুর্থতম খলীফা এখানেই দারুল খিলাফা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই ব্যাপকভাবে সাহাবা কেরামের এখানে আসা—যাওয়া ছিলো। এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়।

মূলকথা যেখানে সাহাবা কেরামের তালীম ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে, সে অনুসারেই আমল হয়েছে, সেখানেরও একই হুকুম।

ইমাম কাশ্মিরী রাহ. (১৩৫৩হি.) এ মাধ্যম সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন। আল্লামা ইউসূফ বানূরী রাহ. (১৩৯৭হি.) তাঁর বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেছেন:

تواتر العمل والتوارث، وهو أن يتوارث التعامل بعمل بين المسلمين في كل قرن من القرون، أي من قرن الرسالة إلى آخر القرون، والعمل برفع اليدين عند الركوع وترك العمل به وأمثال ذلك المسائل من هذا القبيل من التواتر، وهذا الثالث قريب من الثاني. وقال : وبالجملة لا يحتاج التوارث المتواتر وتواتر الطبقة إلى إسناد متواتر، ولا يدفعه خبر واحد، ويكفي فيما كان مقطوعا به في الأصل بقرائن قاطعة تسامع بعد ذلك والله أعلم.

"তাওয়াতুরে আমল: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের পর্যন্ত সর্ব কালে মুসলমানদের মাঝে যা (ব্যাপক প্রচলন) হিসেবে চলে আসছে। রুকূর সময় হাত উঠানো অথবা না উঠানো এ জাতীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর তৃতীয় প্রকারটি প্রায় দ্বিতীয় প্রকারের ন্যায়। সারকথা, (তাওয়াতুরে তাবাকা) আর (তাওয়ারুসে মুতাওয়াতের) এর ক্ষেত্রে ইসনাদে মুতাওয়াতিরের প্রয়োজন নেই। এবং খবারে ওয়াহিদের কারণে তা পরিত্যাজ্য করা হয় না। অকাট্য করীনার মাধ্যমে তার আমল ছাবেত হওয়াটাই যথেষ্ট।"

প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যম নির্ণয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে। মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিসগণ তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় মাধ্যমের মান

যুগে যুগে ইমাম এ মাধ্যম নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং 'গ্রহণযোগ্য' বলে বিবেচনা করেছেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোনো হাদীস মাশহুর হয়ে যাওয়াই এ কথার দলিল যে, হাদীসটি প্রামাণ্য। সহীহ বলার প্রয়োজন নেই। এ প্রকারের হাদীস সবার নিকটেই প্রমাণযোগ্য। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. এর বক্তব্য ব্যাখ্যাসহ পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিম্নে আরো কিছু ইমামের বক্তব্য তুলে ধরা হলো।

ইমাম ইবনে মাহদী রাহ. বলেন:

السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث، وقال أيضا: إنه ليكون عندي في الباب الأحاديث الكثيرة فأجد أهل العرصة —أي الحي— على خلافه فيضعف عندي —أو نحوه—.

"আহলে মদীনায় প্রচলিত পূর্ববর্তীদের 'সুন্নাহ' হাদীস থেকেও উত্তম। তিনি আরো বলেন, আমার নিকট একটি অধ্যায় সংক্রান্ত বহু হাদীস থাকে, কিন্তু মানুষদের (আহলে ইলম) দেখি, তারা এর উপর আমল করে না। বিধায় আমার নিকট উক্ত হাদীসগুলো দুর্বল প্রকৃতির মনে হয়।"

ইমাম রবীআতুর রায় রাহ. বলেন:

ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد، لأن واحدا عن واحد ينتزع السنة من أيديكم.

"হাজার জনের বর্ণনা হাজার জন থেকে (তাআমুল তাওয়ারুস) তা আমার নিকট প্রিয় একজন থেকে একজনের বর্ণনার চাইতে। কারণ একজন অপর একজন থেকে বর্ণনার মাধ্যমে তোমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহকে ছিনিয়ে নিবে।"

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৪৬৩হি.) এক হাদীসের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন:

وهذا يدلك على أنه حديث صحيح المعنى يتلقى بالقبول والعمل الذي هو اقوى من الإسناد المنفرد.

"(ফুকাহা কেরামের সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা) এ কথা প্রমাণ করে যে, হাদীসটি 'সহীহুল মা'না বা গ্রহণ ও আমল উভয় দিক থেকে 'মুতালাক্কা'। আর তালাক্কী একক সনদ থেকে অধিক শক্তিশালী।"

সুতরাং এ মাধ্যমে কোনো হাদীস বর্ণিত হলেÑ অবশ্যই মেনে নিতে হবে। যেমনটি ইমাম বুখারী রাহ.—সহ অন্যান্য ইমামগণ মেনে নিয়েছেন।

এখানে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়,

প্রথমত: এ মাধ্যমের বর্ণনাকারী অসংখ্য হওয়ায় এবং মূল বক্তব্য ও নির্দেশনা প্রসিদ্ধ হওয়ায়Ñ একক বর্ণনার প্রয়োজন বাকী থাকেনি। যেমনটি আমরা প্রথম মাধ্যমে বলেছি। তাই তো এই বিধানগুলোর ক্ষেত্রে কখনো কখনো একক বর্ণনা পাওয়া যায় না বা গেলেওÑ তাতে বিভিন্ন আপত্তি থাকে, অথচ 'উক্ত' আমল প্রথম থেকেই মুসলমানের মাঝে জারী আছে। এ মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস কখনো সহীহ সনদেও বর্ণিত হয়েছে। এর পরিমাণও কম নয়।

দ্বিতীয়ত: মৌলিক আকীদাগুলো এবং ইবাদতের বৃহৎ সংখ্যক বিধান এই দু'মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে আর আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। যেমন:

ক. নামাযে তাহ্রীমার সময় 'হাত উঠানো' প্রথম মাধ্যমে প্রমাণিতÑ কারো দ্বিমতের সুযোগ নেই।

খ. 'রুকূ পূর্বা—পর হাত না উঠানো'Ñ দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রমাণিত।

গ. ইমামের পিছনে 'মুকতাদীর সূরা ফাতিহা' না পড়া ইত্যাদি।

এগুলো সব দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রমাণিত, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। বক্ষ্যমাণ কিতাব অধ্যয়ন করলে আরো উদাহরণ পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় মাধ্যম: নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির গ্রহণ ও বিবরণ

হাদীস ও সুন্নাহ বর্ণিত হওয়ার সর্বশেষ মাধ্যম, একক ব্যক্তির বর্ণনা। একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অপর নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করবে। এ মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসকে ইমাম শাফেঈ রাহ. (২০৪হি.) 'খবারুল খাছছা' বলেছেন। আর সাধারণত 'উসূলুল হাদীসের' কিতাবে 'খবারুল আহাদ' বলা হয়। ইবনে হাযম রাহ. (৪৫৬হি.) এ মাধ্যম সম্পর্কে বলেছেন:

والثالث : ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن.

"তৃতীয় প্রকার: যা ছেকাহ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে ছেকাহ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা করেছে এবং এই ধারাবাহিকতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞগণই এ বিষয়টি বুঝতে পারেন।"

ইবনে হাযম রাহ. (৪৫৬হি.) শুধু ছেকাহর কথা বললেও এ মাধ্যমটি আরো ব্যাপকতর। এ ব্যাপকতাকে লক্ষ রেখে আমরা সামনের আলোচনা পড়বো।

আলোচনা থেকেই বুঝা যাচ্ছে, একক ব্যক্তির বর্ণনাই এ মাধ্যমের আলোচ্য বিষয়। প্রসিদ্ধ পরিভাষা অনুসারে এ মাধ্যমকে 'সনদ' বলা হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মুজতাহিদগণ ও অনেক মুহাদ্দিস প্রসঙ্গে অপ্রসঙ্গে তিনটি মাধ্যম নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে মুহাদ্দিসগণের আলোচনায় তৃতীয় মাধ্যম প্রাধান্য পেয়েছে। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমের আলোচনা তাঁরা হয়তো করেননি; বা করলেও খুবই অপ্রতুল। প্রথম দুই মাধ্যমের উসূল ও তাতবীক সম্পর্কে আলোচনা তাঁরা কেন করেননি? তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনুস সালাহ রাহ. বলেন:

ومن المشهور: المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم®

"খবারে মাশহুরের আরেকটি প্রকার হলো, মুতাওয়াতির। যেটাকে ফুকাহা ও উসূলবিদগণ উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু মুহাদ্দিসীনগণ এটাকে এই নামে ও তার নির্দিষ্ট অর্থে উল্লেখ করেন না। যদিও হাফিয খতীব বাগদাদী রাহ. (৪৬৩হি.) এ প্রকারটিকে উল্লেখ করেছেন। তার আলোচনা থেকে অনুমেয়, যথাসম্ভব তিনি এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের অনুসরণ করেননি। কারণ, মুহাদ্দিসগণের কর্মধারা ও বর্ণনার 'ধারা' এ প্রকারটিকে শামিল করে না।"

উসূলে হাদীসের কিতাবে এ প্রকারটির আলোচনা না থাকায় অনেকে ভেবেছেন, হাদীস শাস্ত্র বলতে শুধু সনদ কেন্দ্রিক বা এই তৃতীয় মাধ্যম কেন্দ্রিক আলোচনাকেই বুঝানো হয়। বাস্তবতা যদি তাই হতো, তাহলে ইমাম বুখারী রাহ.সহ অন্যান্য ইমামগণ কেন এই প্রকারটিকে গ্রহণ করলেন?? বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। আমরা লক্ষ করলেই

বুঝতে পারবো, উসূলে হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, হাদীস ছাবিত বা প্রমাণিত কি না তা নিশ্চিত করা। প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমের ব্যাখ্যায় আমরা জেনেছি যে, সর্বস্বীকৃতভাবে এ উভয় মাধ্যম দ্বারা হাদীস প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ মাধ্যমগুলো উসূলে হাদীসের অংশ। এবং মুজতাহিদ মুহাদ্দিসীগণ তা নিয়ে আলোচনাও করেছেন।

তৃতীয় মাধ্যমের মান

পূর্বের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি, এ মাধ্যমটি সনদ কেন্দ্রিক। আর সনদের মান নির্ণয় সম্পূর্ণ ইজতিহাদ নির্ভর। যদি গ্রহণযোগ্যতার সমুহ শর্ত বিদ্যমান থাকলে তা স্বীকৃত হবে। তাও তৃতীয় মাধ্যম হিসেবে। তবে গ্রহণযোগ্যতার সমুহ শর্ত বিদ্যমান কি না তা নির্ণয় করা এ মাধ্যমের সর্বাধিক জটিলতম বিষয়। এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদে বহুবিধ মতানৈক্য হয়েছে। এমনিভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসের নির্দেশনা তৃতীয় মাধ্যমে বর্ণিত নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিকপূর্ণ হওয়া অবস্থায় এর সমাধান করাও একটি জটিলতম বিষয়। এবং এ ক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।ু সর্বোপরি এ মাধ্যমে বর্ণিত সকল হাদীস এক পর্যায়ের নয়। ইমাম বায়হাকী রাহ. (৪৫৮হি.) এ বিষয়ে সুন্দরই বলেছেন:

إنّ الأخبار الخاصة المروية على ثلاثة أنواع:

نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته،

وهذا على ضربين:

أحدهما: أن يكون مرويّا من أوجه كثيرة، وطرق شتى حتى دخل في حد الاشتهار، وبعد من توهّم الخطأ فيه، أو تواطؤ الرواية على الكذب فيه.

والضرب الثاني: أن يكون مرويا من جهة الآحاد، ... مستجمعا لشرائط القبول فيما يوجب العمل،...

وأما النوع الثاني من الأخبار، فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها.

وهذا النوع على ضربين:

ضرب رواه من كان معروفا بوضع الحديث والكذب فيه.

...

وضرب لا يكون روايه متهما بالوضع، غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط، في رواياته، أو يكون مجهولا لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول.

...

وأما النوع الثالث، من الأحاديث فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته: فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته خفى ذلك عن غيره، أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره، وقد وقف عليه غيره، أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه غيره جرحا، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه، أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه. أو دخول إسناد حديث في حديث خفى ذلك على غيره.

فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم، ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد، ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها®

“খবারে খাছছা তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার, এমন হাদীস যার সহীহ হওয়ার উপর আহলে ইলমগণ সর্বসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এটি আবার দুই প্রকার: প্রথমটি হলো, যা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এমনকি তা এত ব্যাপক প্রসিদ্ধ লাভ করেছে যে, এখানে রাবীদের ভুল বা তাদের উপর মিথ্যার ধারণাও করা যায় না।

দ্বিতীয়টি হলো, যা একক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এবং হাদীসটি মাকবুল হওয়ার সমুহ শর্ত তার মাঝে বিদ্যমান। যার উপর আমল করা ওয়াজিব।

আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, যে হাদীসের সনদগত দুর্বলতার উপর আহলে ইলমগণ সর্বসম্মত হয়েছেন। এটিও দুই প্রকার: এক প্রকার হলো, বর্ণনাকারী হাদীস জালকারী বা মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত ।... আরেক প্রকার হলো, যার বর্ণনাকারী মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত নয়। তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল ও বেশি ভুলে অভ্যস্ত অথবা মাজহুল। এবং তার বর্ণিত হাদীসটি কবুল হওয়ার মত শর্তসমুহ পাওয়া যায় না। ...

তৃতীয় প্রকার হলো, এমন হাদীস যার প্রামাণ্যতা নিয়ে আহলে ইলমগণ বিভিন্ন 'মত' ইখতিয়ার করেছেন। কেউ নিজ ইজতিহাদ অনুসারে রাবীদের উপর জারহ থাকার কারণে হাদীসটি দুর্বল মনে করেন। আবার কারো এ জারহ সম্পর্কে জানা নেই। অথবা কারো নিকট হাদীসটি গ্রহণ করা যায় এ পর্যায়ের কোনো তথ্য তার জানা নাই। যা অন্য আরেকজন জানেন। অথবা একজন একটি বিষয়কে জারহ মনে করেন কিন্তু অন্যজন এটিকে জারহ মনে করেন না। অথবা কেউ সনদে বিচ্ছিন্নতা, কিছু শব্দের বিচ্ছিন্নতা, রাবী কর্তৃক হাদীসে শব্দ অনুপ্রবেশ, এক হাদীসের সনদ অন্য হাদীসের মাঝে প্রবিষ্টকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারেন অন্যজন নাও জানতে পারেন। এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের কর্তব্য হলো, ইমামগণের গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষেত্রে এই মতভিন্নতাকে ভালোভাবে বুঝার সর্বাত্বক চেষ্টা করবে। তারপর অধিক সহীহ মতটি গ্রহণ করবে।"

ইমাম বায়হাকী (৪৫৮হি.) রাহ. তৃতীয় স্তরের ক্ষেত্রে ইখতিলাফের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইখতিলাফ শুধু তৃতীয় স্তরের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি ইখতিলাফের ক্ষেত্রে যোগ্য হাদীস বিশ্লেষককে চিন্তা—ভাবনা করে কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বলেছেন। আর যারা সাধারণ মানুষ বা হাদীস বিশ্লেষণের যোগ্যতা রাখে না তাদের ক্ষেত্রে সর্বজনবিদিত সিদ্ধান্ত হলো, তারা বিশেষজ্ঞদের তাকলীদ করবে।

আমাদের করণীয়

আশা করি পূর্বের আলোচনা দ্বারা হাদীস প্রমাণিত হওয়ার তিন মাধ্যম সম্পর্কে আমরা প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছি। এবং কিছু জটিলতাও বুঝতে পেরেছি।

এখন জানার বিষয় হলো, আমাদের করণীয় কী? নিম্নে আমাদের করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা তুলে ধরছি।

আমরা যারা সাধারণ পাঠক আছি, তাদের জন্য সরাসরি উসূল ও নীতিমালার আলোকে কোনো এক মাধ্যম নিরুপন করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামদের জিজ্ঞাসা করে আমাদের চলতে হবে। তাঁদের পক্ষ থেকে আমাদের কিছু করণীয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. প্রথম দুই প্রকার মাধ্যমে বর্ণিত বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়া

আমরা মাধ্যমগুলোর স্তরভেদ জেনে এসেছি, সে হিসেবে যদি প্রথম মাধ্যম বা দ্বিতীয় মাধ্যম দ্বারা কোনো বিধান প্রমাণিত হয়, আর তৃতীয় মাধ্যমে ওগুলোর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়Ñ তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রমাণিত বিধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সাহাবা ও তাবেঈন রা. এ নীতি অবলম্বন করেছেন। যেমন, হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স রা. নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আমের শা'বী রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله ، عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فقالت: فخاصمته إلى رسول الله ، في السكن والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة...

"আমি ফাতেমা বিনতে কায়স এর নিকট গিয়ে তার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। এরপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাসস্থান ও ভরপোষণের ফায়সালা চাইলে তিনি আমার জন্য কোনো বাসস্থান ও ভরপোষণের ফায়সালা প্রদান করেননি।"

এ হাদীসটি হযরত ওমর ও হযরত আয়েশা রা. এর দৃষ্টিতে কুরআন—সুন্নাহ তথা প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমে বর্ণিত বিধানের মুখালিফ ছিলো। তাই তারা এ হাদীস তথা তৃতীয় মাধ্যমে বর্ণিত বিধান গ্রহণ করেননি। তাই হযরত ওমর রা. বলেছেন:

لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت
" একজন মহিলার বর্ণনার দরুন আমরা কিতাবুল্লাহর স্বীকৃত বিধানকে ছেড়ে দিতে পারি না। অথচ সে সঠিকভাবে মনে রেখেছে না ভুলে বসেছে তা আমাদের জানা নেই!!"
হযরত উরওয়া রা. হযরত আয়েশা রা. মন্তব্য সম্পর্কে বলেন:
لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب......
"আয়েশা রা. ফাতেমা বিনতে কায়সের এ কথায় অনেক কঠিন আপত্তি করেছেন।"
কুরআন ও সুন্নাতে মুসতাফীযাহর সম্পূর্ণ বিপরীত কোনো খবারে ওয়াহিদ থাকলে তা গ্রহণ করা যাবে না বা ব্যাখ্যা করতে হবে। এ বিষয়ে প্রায় সকল ইমাম একমত। হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম খতীব বাগদাদী রাহ. (৪৬৩হি.) খবারে ওয়াহিদ কে পরিত্যাগ করার আলোচনায় বলেন:
إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور:
أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه ، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول ، وأما بخلاف العقول، فلا.
والثاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة ، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ.
والثالث: أن يخالف الإجماع ، فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له ، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ ، وتجمع الأمة على خلافه ، وهذا هو الذي ذكره ابن الطباع في الخبر الذي سقناه عنه أول الباب.
والرابع: أن ينفرد الواحد براوية ما يجب على كافة الخلق علمه ، فيدل ذلك على أنه لا أصل له ، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل، وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم.
والخامس: أن ينفرد الواحد براوية ما جرت به العادة ، بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل ، لأنه لا يجوز ، أن ينفرد في مثل هذا بالرواية
"নির্ভরযোগ্য 'মামুন' রাবীর অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীস কয়েকটি কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়।
প্রথম, সুস্থ মস্তিষ্ক ও আকলের বিপরীত নির্দেশনা যদি তার হাদীসে থাকে। তখন হাদীসটি বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, শরীআতে সুস্থ আকলের পরিপন্থী কোনো বিধান আসেনি।
দ্বিতীয় প্রকার, কুরআন বা সুন্নাতে মুতাওয়াতিরার সাথে সাংঘর্ষিকপূর্ণ হলে বুঝা যাবে যে, এর কোনো মুলভিত্তি নেই, বা হাদীসটি রহিত।
তৃতীয় প্রকার, হাদীসটি ইজমাহর মুখালিফ হলে এ কথা বুঝা যাবে যে, এটি মানসূখ বা এর কোনো মুলভিত্তি নেই। কারণ, এমন হতে পারে না যে, একটি হাদীস মানসূখও নয় এবং সহীহ এমন হাদীসের বিপরীত উম্মাহর সকলে একমত পোষণ করবে। ইবনে তাব্বা' রাহ. এমনটি উল্লেখ করেছেন যা আমরা এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করেছি।
চতুর্থ প্রকার, এমন একটি হাদীস শুধু একক সূত্রে বর্ণিত হওয়া অথচ এর জ্ঞান রাখা সকলের জন্য আবশ্যক। তাই এরূপ হলে বুঝতে হবে যে, এর কোনো ভিত্তি নেই, কারণ, এর কোনো ভিত্তি থাকলে এ বিরাট সংখ্যক উম্মাহ থেকে শুধু সে এককভাবে বর্ণনা করবে আর অন্য কেউ জানবে না কল্পনাতীত।
পঞ্চম প্রকার, এমন হাদীস এককভাবে বর্ণনা করা যার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিষয় হলো, এটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছার কথা। তাহলে এমন হাদীস গ্রহণ করা হবে না। কারণ, এমন একটি বিষয়ে একক বর্ণনা ধারণাতীত।"
এ আলোচনাটি মাথায় রেখে চিন্তা করুন যে, কুরআনে এরশাদ হয়েছে:
{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
"আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন কান লাগিয়ে তা শুনো এবং নিশ্চুপ থাকো, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।"
কুরআন কারীম অর্থাৎ প্রথম মাধ্যম দ্বারা প্রমাণিত, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ– 'যখন কুরআন পড়া হয়, চুপ থাকো।'

অপরদিকে এর বিপরীত কোনো নির্দেশনা প্রথম মাধ্যমে বর্ণিত হয়নি। লা—মাযহাবী ও সালাফী ভাইয়েরা যে হাদীস দিয়ে দলিল দিয়ে থাকেন তা তৃতীয় মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। বিধায় প্রথম মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়টি প্রাধান্য হবে। তাইতো সালাফীদের ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহ. 'জাহরী' নামাযের ক্ষেত্রে কুরআন তথা প্রথম মাধ্যম দ্বারা প্রমাণিত দলিলকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

শায়খ আলবানী মারহুমের (১৪২০হি.) 'আমীন' এর এক আলোচনা থেকে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন:

ومن المعلوم أن التأمين دعاء، والأصل فيه الإسرار لقوله تعالى : {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِين} فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح.

"সর্বজনবিদীত কথা হল, 'আমীন' একটি দুআ। আর দুআ মূলত চুপিসারে করা হয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা বিনীত হয়ে ও চুপিসারে নিজেদের প্রতিপালককে ডাকো, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" তাই দলীল ছাড়া এই মূলনীতি ত্যাগ করা যাবে না।"

এমনিভাবে নাভির নিচে/উপরে হাত বাঁধা দ্বিতীয় মাধ্যম দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে বুকের উপর বাঁধার কোনো 'সহীহ' ও 'সরীহ' স্বীকৃত হাদীস নেই। কোনো মত মেনে নিলেও তা তৃতীয় মাধ্যমের। সুতরাং তা অগ্রগণ্য হবেনা।

এ ছাড়া আরো অনেক উদাহরণ আছে, বক্ষমাণ কিতাব মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করলে পরিস্কার হবে। ইনশাআল্লাহ।

খ. নামাযসহ অন্যান্য ইবাদাতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রথম দুই প্রকার মাধ্যমকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীস ও সীরাত বিষয়ক জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তির নিকট তা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

প্রিয় পাঠক! আপনি চিন্তা করে দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদাতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন আমলে বাস্তবায়ন করার জন্য। সুতরাং ইবাদাতের পদ্ধতি সংক্রান্ত হাদীসের উপর সাহাবা কেরামগণের আমল থাকাটাই স্বাভাবিক। আর আমল না থাকাটা অস্বাভাবিক। কারণ, তখন প্রশ্ন জাগে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমল করার জন্য, অথচ সাহাবা কেরাম রা. এর আমল পাওয়া যাচ্ছে না কেন?। নিশ্চয়ই এখানে কোনো জটিলতা রয়েছে।

সর্বোপরি সালাফের অনেক ইমাম ইবাদাতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে মুতাওয়াতির ও মাশহুরের সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন।

ইমাম ইবরাহীম নাখায়ী, ইমাম রবীআ, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রাহ.—সহ অধিকাংশ সালাফ ইমামগণ আকীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে এই 'দু' মাধ্যমকে' মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতেন। সাহাবা ও তাবেঈনদের মাঝেও এই নীতিটি বেশি ছিলো।

শরীয়তের যে বিধানগুলো প্রমাণিত হওয়ার জন্য শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রাহ.সহ অনেকেই প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রমাণিত হাদীসই গ্রহণ করতেন। তৃতীয় মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করতেন না। বিশেষকরে ফরয, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে। ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. এ মূলনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন:

ولذلك قال أصحابنا ما كان من أحكام الشريعة بالناس حاجة إلى معرفته فسبيل ثبوته الاستفاضة والخبر الموجب للعلم وغير جائز إثبات مثله بأخبار الآحاد.

"তাই আমাদের ফুকাহাগণ বলেছেন, শরীআতের যে সমস্ত বিধান মানুষের জানা থাকা/ আমল করা প্রয়োজন/আবশ্যকীয়, এগুলো প্রমাণ হওয়া একমাত্র মুসতাফীয ও ইলমে ইয়াকীনের ফায়দা দানকারী খবারের মাধ্যমেই সম্ভব। এ সমস্ত বিধান খবারুল ওয়াহিদ দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।"

গ. সনদ পাওয়া না গেলেই কোনো বিধানকে অস্বীকার না করা

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, শরীয়তের সব বিধান প্রচলিত ‘সনদের’ মাধ্যমে বর্ণিত হয়নি। অসংখ্য বিধান এমন রয়েছে, যা প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যম দ্বারা প্রমাণিত (কোনো কোনো ক্ষেত্রে সনদ বিদ্যমান আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেই)। তাই যে কোনো বিধানের ক্ষেত্রে নিছক সনদের দাবী করা বাড়াবাড়ি নয় কি?

অনেক লা—মাযহাবী ও সালাফী ভাই সনদ বা তৃতীয় মাধ্যমের ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ির শিকার। কোনো বিধান প্রথম বা দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু এই জন্য তারা অস্বীকার করে বসেÑযেহেতু তার সনদ নেই! তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। তাহলে যেহেতু কুরআনে কারীম সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। তাই সনদ না থাকার কারণে কুরআনকে অস্বীকার করবেন?!

মূলত মুহাদ্দিসীনগণ সনদকে অবলম্বন করেছিলেন দীনের হিফাযাতের জন্য। আর লা—মাযহাবী ও সালাফীরা সনদকে ব্যবহার করে দীনের স্বীকৃত বিধানকে বাদ দিতে চাইছে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।

ইমাম কাশ্মিরী রাহ. (১৩৫৩হি.) সুন্দর বলেছেন:

كان الإسناد لئلا يدخل في الدين ما ليس منه ، لا ليخرج من الدين ما ثبت منه من عمل أهل الإسناد®.

“দীন বহির্ভুত বিষয় যেন দীন হিসেবে চালিয়ে না দেওয়া যায় এজন্যই সনদকে অবলম্বন করা হয়েছে। তবে এটা নয় যে, সনদের বাহানায় তালাক্কীর মাধ্যমে প্রমাণিত দীনী বিষয়কে দীন থেকে বের করে দেওয়া হবে! ”

সুতরাং কোনো বিধান প্রথম বা দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রমাণিত হলে নিছক সনদের অযুহাতে তা বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই।

ঘ. সহীহ হাদীসকে ‘ছেকাহ্্র’ সনদের মাঝে সীমাবদ্ধ না করা

আমরা জেনে এসেছি, সনদ তৃতীয় মাধ্যম। প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসও সহীহ ও প্রমাণিত। অনেকেই এ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিন করে থাকে। তাদের ধারণা, সনদের রাবী ছেকাহ্ না হলেÑ হাদীস সহীহ হয় না। সুতরাং ছেকাহ্ রাবীর সনদ ব্যতীত হাদীস মানা যাবে না। এই ধারণা যথার্থ নয়। কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমে যা প্রমাণিত হচ্ছেÑ এগুলোরও অনেক সময় ছেকাহর সনদ খুঁজে পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও সেগুলো ‘সহীহ’; শুধু ‘সহীহ’ নয়, রবং তারচে’ ‘শক্তিশালী’।

ইমাম বুখারী রাহ.—সহ অন্যান্য ইমামগণ তাদের ধারণা গ্রহণ করেননি। বরং সালাফীদের মাঝে যারা সচেতন, তারা এ ধারণাকে সমর্থন করেন না। বিষয়টি ‘দলীলভিত্তিক’ আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র কিতাব রচনা দাবি রাখে। এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

ইমাম বুখারী রাহ. “هو الطهور ماؤه ،والحل ميتته” হাদীসকে সহীহ বলেছেন। অথচ সনদের রাবী ছেকাহ্ নন, বরং দুর্বল। এইজন্য ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৪৬৩হি.) বলেন:

لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده.

“ইমাম বুখারী রাহ. কিভাবে সহীহ বললেন তা আমার বোধগম্য নয়। তার নিকট যদি সহীহ হতো, তাহলে তিনি তার সহীহ কিতাবে উল্লেখ করতেন। অথচ তিনি তা করেন নি। কারণ, তিনি সহীহ কিতাবে শুধুমাত্র সনদের দিক থেকে সহীহ এরূপ হাদীস উল্লেখ করার মনস্থ করেছেন। আর মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের সনদকে প্রমাণযোগ্য মনে করেন না।”

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৪৬৩হি.) এ কথা বলার পর তিনি নিজেই বলেছেন, ‘হাদীস’টি আমার নিকট ‘সহীহ’। এবং তার কারণও ব্যাযখা করেছেন। তিনি বলেন:

وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء وإنما الخلاف في بعض معانيه.

“আমার নিকট হাদীসটি সহীহ। কারণ আহলে আহলে ইলমগণ তালাক্কী ও আমলে নিয়েছেন। সার্বিকভাবে এ হাদীসের ক্ষেত্রে ফুকাহাগণের কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে হাদীসের কিছু অর্থ নির্ণয়ে মতান্তর রয়েছে।”

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৪৬৩হি.) এর কারণ দর্শানো থেকে আমরা বুঝতে পারছি, তিনি দ্বিতীয় মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটিকে সহীহ মনে করছেন।

ইমাম ইবনে হাজার রাহ. এ সম্পর্কে বলেন:

ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك بصحته لتلقي العلماء ، رده ابن عبد البر من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى ®.

“ইবনে আবদুল বার রাহ. সনদে দুর্বলতা থাকার পরেও ‘তালাক্কীর’ কারণে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. সনদগত দিক থেকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থগত দিক থেকে তা আবার গ্রহণ করলেন।”

তাহলে আমরা দেখলাম যে, ইমাম বুখারী রাহ. সহ অনেক ইমাম হাদীসটিকে ‘সহীহ’ বলেছেন। অথচ তা কোনো ছেকাহ সূত্রে বর্ণিত নেই। খতীব বাগদাদী রাহ. (৪৬৩হি.) সহ আরো অনেকে এমন মন্তব্য করেছেন।

সালাফীদের বিশিষ্ট আলেম শায়খ আবু মুআয এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন উদাহরণ টেনে প্রমাণ করেছেন যে, যে হাদীসের সনদ নেই। তবে তার দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাধ্যম রয়েছে, তা হলেও হাদীস সহীহ হতে পারে। এমনকি তিনি ‘সহীহ’কে দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন।

এক. “صحيح الإسناد”Ñ যা তৃতীয় মাধ্যমে বর্ণিত

দুই. “صحيح المعنى”Ñ যা দ্বিতীয় বা প্রথম মাধ্যমে বর্ণিত

তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন:

ومن ذلك أيضا : أنهم قد يطلقون اسم الصحيح على ما يصح من جهة المعنى، وإن لم يصح من جهة الرواية، فيقولون : صحيح : أي صحيح المعنى.

“সহীহের আরেকটি প্রকার হলো, তাঁরা (মুহাদ্দিসীনগণ) মতনগত দিক থেকে সহীহ হাদীসের উপরেও ‘সহীহ’ শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন। যদিও সনদগত দিক থেকে তা সহীহ নয়। তখন তাঁরা বলেন, সহীহ অর্থাৎ সহীহুল মা’না। (অন্যান্য আলামতের ভিত্তিতে মতনগত দিক থেকে সহীহ)”

সুতরাং শুধু সনদে ছেকাহ রাবী থাকলেই হাদীসকে সহীহ বলা হবে অন্যথায় হাদীসকে সহীহ বলা যাবে না, এমন ধারণাই ভুল। বাকী মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদীসের ক্ষেত্রে সহীহ শব্দে হাদীসের ‘মান’ বুঝানোর প্রয়োজন থাকে না। যেহেতু তার চেয়ে বড় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই ইমামগণ এ ক্ষেত্রে ‘মাশহুর’ মারূফ’ মুসতাফীয’ বা ‘সুন্নাহ’ শব্দ বেশী ব্যবহার করেছেন।

ঙ. সহীহ হাদীস নির্দিষ্ট কিতাবে সীমাবদ্ধ মনে না করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা কেরাম রা. তা সংরক্ষণ করেছেন আমল, মুখস্থ, লেখনী ও মুযাকারার মাধ্যমে। এবং পরবর্তীরাও সংরক্ষণ করেছেন। তবে কেউই দাবী করতে পারবেনা যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল হাদীস মুখস্থ করে ফেলেছে।

ইমাম শাফেঈ রাহ. (২০৪হি.) বলেন:

لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيءٌ. فإذا جُمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فُرّق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم ما كان ذهب عليه منها موجوداً عند غيره. وهم في العلم طبقات منهم الجامع لأكثره، وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقلَّ مما جمع غيره.

“আমার এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানা নেই, যে সমস্ত সুনানকে বেষ্টন করেছে, এমনকি কিছু অংশও তার থেকে ছুটে যায়নি। আহলে ইলম সকলের ইলমের সমষ্টির মাধ্যমে পরিপূর্ণ সুনানের রূপ প্রকাশ পাবে। আর প্রত্যেকের ইলমকে আলাদা আলাদা করা হলে তখন ধরা পড়বে যে, কারো থেকে কোনো অংশ ছুটে গেছে। যা অন্য কারো নিকট পাওয়া যাচ্ছে।

আহলে ইলমগণ ইলমী দিক থেকে কয়েক স্তরে বিভক্ত। তাঁদের মাঝে কেউ অধিকাংশ সুন্নাহই জানেন। যদিও তার থেকে কিছু অংশ ছুটে গিয়েছে। আর কেউ আছেন যারা অন্যদের তুলনায় কম অংশের আলেম।”

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রাহ. আরো সুন্দর বলেন:

وانما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته
وأما احاطة واحد بجميع حديث رسول الله فهذا لا يمكن ادعاؤه قط..... فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها فمن بعدهم أنقص فخفاء بعض السنة عليه أولى فلا يحتاج الى بيان فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو امام معينا فهو مخطىء خطا فاحشا قبيحا.

"সাহাবা কেরাম রা. ও উলামাগণের মাঝে ইলমের আধিক্যতার দিক থেকে কতক থেকে কতক অধিক মর্যাদাবান। আর একজনের পক্ষে সকল হাদীস বেষ্টন করা, এ দাবী কখনো সম্ভব নয়।.....

তাঁরা (সাহাবা কেরাম রা.) ছিলেন উম্মাহর মাঝে অধিক জ্ঞানী, ফকীহ, পরহেযগার, মর্যাদাবান। তাঁদের পরবর্তীরা তাদের থেকে আরো নিম্নমানের। তাই পরবর্তীদের থেকে কিছু হাদীস ছুটে যাওয়া স্বাভাবিক। যা বয়ান করার প্রয়োজন নেই। তাই কেউ যদি ধারণা করে যে, ইমামগণের সকলের নিকট বা নির্দিষ্ট ইমামের নিকট সকল সহীহ হাদীস পেঁাছেছে। তা নিতান্তই ভুল হবে।"

সালাফের ইমামগণ সব হাদীস একজন না জানলেও অধিকাংশই জানতেন। বরং সহীহ বুখারীতে যা আছে, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী জানতেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রাহ. বলেন:

®بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير

"বরঞ্চ যাঁরা হাদীস সংকলনের পূর্বে ছিলেন, তাঁরা পরবর্তীদের চে' সুন্নাহ সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখতেন।"

প্রিয় পাঠক! আপনি নিজেই চিন্তা করুন যে, হাদীস বর্ণিত হয়েছে তিন মাধ্যমে। এ মাধ্যমসমুহে বর্ণিত সমুহ হাদীসই প্রামাণ্য। দুনিয়াতে এমন কোনো কিতাব নেই, যে কিতাবে এ তিন মাধ্যমে বর্ণিত সকল হাদীস জমা করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত এমনটি কেউ দাবীও করেনি। এটা একটি জলন্ত বাস্তবতা।

তাহলে আপনি কিভাবে দাবী করবেন যে, সব সহীহ হাদীস এক কিতাবেই জমা করা আছে, এর বাহিরে যা আছে তা মানব না।

প্রসিদ্ধ দুই কিতাব সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর বিষয়েই চিন্তা করুন যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহ. (২৬১হি.) তৃতীয় মাধ্যম অর্থাৎ সনদ কেন্দ্রিক সহীহ হাদীসকে একত্রিত করেছেন। যেমনটি পূর্বোল্লিখিত ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৪৬৩হি.) এর কথা থেকে অনুমেয়। তাঁরা সকল প্রকার মুতাওয়াতির ও মুসতাফীয জমা করবেন এমন ইচ্ছাই করেননি। এমনকি সনদ কেন্দ্রিক সকল হাদীসকে সংকলন করার ইচ্ছা পোষণও করেননি।

তাঁরা নিজেরাই বলেছেন যে, সব (সনদ কেন্দ্রিক) সহীহ হাদীস একত্রিত করেননি।। যেমন, ইমাম বুখারী রাহ. বলেছেন:

®الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول ما أدخلت في كتابي

"আমার 'জামে' কিতাবে শুধু সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছি। আর আমি কিতাব বড় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বহু সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে দিয়েছি, উল্লেখ করিনি।"

ইমাম মুসলিম রাহ. (২৬১হি.) বলেছেন:

®ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا انما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه

"আমার নিকট হাদীস সহীহ হলেই এ সহীহ কিতাবে উল্লেখ করেছি, বিষয়টি এমন নয়। বরং আমি ঐ সমস্ত সহীহ হাদীস উল্লেখ করেছি যার ব্যাপারে তারা ইজমা হয়েছেন।"

এরপরও কিছু 'মহলের' আচরণ ও উচ্চারণ থেকে বুঝা যায়, তারা সহীহ হাদীসকে শুধু বুখারী—মুসলিম রাহ. এর কিতাবদ্বয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ মনে করেন। এর বাইরে সহীহ হাদীস নেই; থাকলেও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মানোত্তীর্ণ নয়। অনেকে তো সহীহ বুখারী সহীহ মুসলিমকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে হাদীসকে অস্বীকার করে বসেন। মাআযাল্লা। এদের দিক ভেবেই ইমাম আবু যুরআ (২৬৪হি.) ও ইমাম ইবনে ওয়ারা রাহ. (২৭০হি.) সঠিকই বলেছেন। যেমন, ইমাম নববী রাহ. (৬৭৬হি.) উল্লেখ করেন:

روينا عن سعيد بن عمرو البرذعى أنه حضر أبا زرعة الرازي وذكر صحيح مسلم ... وأنه قال أيضا يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا اذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح ... وقدم مسلم بعد ذلك الرى فبلغنى أنه خرج إلى أبى عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قاله لى أبو زرعة ان هذا يطرق لاهل البدع®

“সাঈদ ইবনে আমর বারযাঈ এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইমাম আবু যুরআ রাহ. এর নিকট উপস্থিত হলেন, সহীহ মুসলিম নিয়ে তাদের মাঝে কথোপকথন চলছিলো...। এক পর্যায়ে আবু যুরআ রাহ. ‘সহীহ’ নাম শুনে এ আশঙ্কা ব্যক্ত করলেন, এ নাম তো বিদআতীদের জন্য আমাদের বিপক্ষে কথা বলার সুযোগ করে দিবে! কারণ, তাদের বিপক্ষে কোনো হাদীস দিয়ে প্রমাণ দিলে তারা বলবে এ হাদীস তো ‘সহীহ’ কিতাবে নেই! .....। ইমাম মুসলিম রাহ. ‘রায়’ নামক শহরে এ ঘটনার পর আগমন করেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার জানা মতে তিনি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ওয়ারা রাহ. এর সাথে মুলাকাত করলেন। (সহীহ মুসলিম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে) ইবনে ওয়ারা রাহ. এ নামকরণের দরুন তার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলেন। এবং ইমাম আবু যুরআ রাহ. আমাকে যেমন আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছিলেন, হুবহু তিনিও এমন আশঙ্কা ব্যক্ত করলেন।”

বাস্তবতা হলো, সহীহ বুখারীর বাহিরেও অনেক হাদীস রয়েছে যা সহীহ বুখারীর হাদীসের সমমানের বা তার চে’ ভালো মানের। যেমন, ইমাম আবু নুআইম আসফাহানী রাহ. (৪৩০হি.) ইরবায ইবনে সারিয়া রা. এর হাদীস সম্পর্কে বলেন:

وهو وإن تركه الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج فليس ذلك من جهة إنكار منهما له فإنهما رحمهما الله قد تركا كثيرا مما هو بشرطهما أولى وإلى طريقتهما أقرب®

“এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাহ. সহীহাইনে অনুল্লেখ তার দুর্বলতার দরুন নয়। কারণ, তারা উভয়ে রাহ. এমন পর্যায়ের হাদীসও ছেড়ে দিয়েছেন, যা তাদের উল্লেখকৃত হাদীস সমুহের চে’ মানে বেশী উত্তীর্ণ ও করেননি।”

নিকট অতিতে বিগত প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা আবদুর রশীদ নুমানী রাহ. (১৪২০হি.) সুনানে ইবনে মাজাহ এর মাঝে এমন সনদ দেখিয়েছেন যা সহীহ বুখারী থেকেও মানগত দিক থেকে শক্তিশালী।

আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, হাদীসের অন্যতম একটি সংকলন হলো, ‘সহীফায়ে হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ’। এ কিতাবের ১৪৩ টি হাদীস রয়েছে, সবগুলো হাদীস এক সনদেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এক হাদীসের যে মান হবে, বাকী সব হাদীসের সে মানই হবে। এ কিতাব থেকে ইমাম বুখারী রাহ. কিছু ও ইমাম মুসলিম রাহ. কিছু হাদীস তাদের সহীহ কিতাদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন। আরো অনেক হাদীসই উল্লেখ করেননি। তাহলে এ হাদীসগুলোর ক্ষেত্রেও কি বলা যাবে যে, হাদীসগুলো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে নেই তার মান নিম্নে, অথচ সব হাদীসের সনদ একটাই!

এছাড়া অধমের শায়খ আলবানী মারহুমের (১৪২০হি.) ‘সিলসিলাতুস সহীহা’ ও ‘সিফাতু সালাতিন নাবী’ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার সুযোগ হয়েছে। এবং মুসনাদে আহমাদের শায়খ শুআইব আরনাঊত রাহ. এর তাহকীককৃত নুসখার চৌদ্দ খণ্ড দেখার সুযোগ হয়েছে। একটি ফিরিস্তি তৈরী করা হয়েছে যে, কতগুলো হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে নেই। অথচ হাদীসটি উভয়টির মানে বা স্বাভাবিক অর্থে সহীহের মানোত্তীর্ণ। এ বিষয়ে আসাতিযা কেরামের পরামর্শে ভিন্নভাবে কাজ করার তামান্না আছে। ইনশাআল্লাহ। (বিস্তারিত জানার জন্য দ্র. উম্মাহর ঐক্য: পথ ও পন্থা)

চ. একজনের ইজতিহাদ সকলের উপর চাপিয়ে না দেওয়া

আমরা পূর্বে জেনেছি, তৃতীয় মাধ্যম ‘রাবী’ও ‘সনদ’ কেন্দ্রিক। আর মাধ্যম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে বিভিন্নভাবে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। প্রত্যেক ইমাম নিজ মতানুসারে আমল করবেন এটাই স্বাভাবিক। একজনের মত সবাইকে মেনে নিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

সালাফী ভাইয়েরা লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের সব ‘সহীহ’ শায়খ আলবানী মেনে নেননি। আবার শায়খ আলবানীর সব ‘সহীহ’ অন্য সালাফী আলেমরাও মেনে নেয়নি। বরং প্রয়োজনে দ্বিমত পোষণ করেছেন। সুতরাং শায়খ আলবানী সহীহ বললে আমাদেরকেও সহীহ বলতে হবে এমন কোনো আবশ্যকীয়তা নেই। অথচ কিছু সালাফী ও লা—মাযহাবী ভাই আছেন, যারা শায়খ আলবানীর কথাকে প্রয়োজনের বেশী মান দিয়ে

থাকে। এমনকি তারা বুঝানোর চেষ্টা করে যে, শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন তো ইমাম আবু হানীফা রাহ. কেও তা মানতে হবে!! কারণ তিনি বলেছেন:

®إذا صح الحديث فهو مذهبي

"সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব"

তারা সংক্ষিপ্ত ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ একটি বাক্য নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চায়। বুঝতেই চেষ্টা করে না এটা ব্যাপকার্থে না শর্তসাপেক্ষ। আর সহীহ কার নিকটে? যেখানে শায়খ আলবানী মারহুমের সব সহীহ স্বয়ং সালাফীরাই মানে না সেখানে আবু হানীফা রাহ. কেন মানতে বাধ্য হবেন?!!! অথচ এই ভুল চিন্তার উপর ভিত্তি করে আজ অনেকেই বিভিন্নভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে!

উল্লিখিত বাক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে দেখুন (আছারুল হাদীস—শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা দামাত বারাকাতুহুম)।

আমরা এখানে সরলভাবে কয়েকটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারি

১. ইমাম আবু হানীফা রাহ. সহ অন্যান্য ইমামগণ হাদীস গ্রহণ করা না করার ক্ষেত্রে একটি কথা বলেই বসে থাকেননি। তারা আরো নিয়ম—নীতির কথা বলেছেন। সুতরাং অন্যান্য নিয়ম—নীতি ছাড়া এই সংক্ষিপ্ত বাক্যকে ব্যাখ্যা করা যথার্থ হবে না।

২. পূর্বেও বলা হয়েছে যে, এখানে প্রশ্ন জাগে, কার নিকট সহীহ হলে কার মাযহাব হিসেবে পরিণত হবে? উদাহরণ স্বরূপ হাদীসের একজন বড় মাপের ইমাম আল্লামা কামাল ইবনুল হুমাম রাহ.। তিনি যদি কোনো হাদীসকে সহীহ বলেন, তাহলে কি এটি শায়খ আলবানী মারহুমের মাযহাব হয়ে যাবে?! সালাফীরা এ কথা মানতে প্রস্তুত হন না। তাহলে কোনো একজন সহীহ বললে তা ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর মাযহাব হতে যাবে কোন যুক্তিতে?!

৩. হাদীস সহীহ হওয়ার মানদণ্ড সকল ইমামের নিকট এক রকম নয়। যা আমরা ইতিপূর্বে জানলাম। তাই ইমাম ইবনে সালাহ রাহ. এর স্থিরকৃত মানদণ্ডে হাদীস সহীহ হলে গ্রহণ করতে হবে— এমন কথা তো ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলে যাননি! বরং তিনি কিছু শর্ত যোগ করে দিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেছেন:

®والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات

"বিশুদ্ধ আছার (হাদীস) যা নির্ভরযোগ্যদের সূত্র পরম্পরায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।"

এ ছাড়া তিনি আরো কিছু শর্তও যোগ করেছেন। উল্লিখিত শর্তাবলীর আলোকেই তাঁর কথাটির ব্যাখ্যা করতে হবে। সুতরাং নিছক বাহ্যিক অর্থ ধরে আমাদের উপর আপত্তি উত্থাপন এক ধরণের বাড়াবাড়ি।

ছ. সর্বসাধারণের জন্য এ ক্ষেত্রে তাকলীদ ছাড়া উপায় নেই

আমরা দেখলাম খবারে ওয়াহিদ পর্যায়ের হাদীসের মান নির্ণয়ে ইমামদের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে। আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি আমাদের এ ক্ষেত্রে তাকলীদ বা অন্যের কথা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। নিজেরাই সিদ্ধান্তে অনুপ্রবেশ মানে শরীআতে বিকৃতি সাধন করার নামান্তর।

আচ্ছা ধরুন, একটি হাদীস ইমাম মুসলিম রাহ. (২৬১হি.) সহীহ মনে করেন। তিনি এ হাদীসের ভিত্তিতে একশত মাসআলা উদ্ঘাটন করেছেন যা আমরা আমল করে থাকি। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী রাহ. ঐ হাদীসটিকে সহীহ মনে করেন না। তাহলে দু'জনই বড় বড় ইমাম। একজনের কথার উপর আমরা যুগ যুগ ধরে আমল করে আসছি। তার কথার দলিলও আছে। তাহলে এখন আমরা কার তাকলীদ করবো? আপনি ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে, ইমাম মুসলিম রাহ. এর কথা গ্রহণ করাই শ্রেয়। সুতরাং আমাদের যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যক্তির তাকলীদ করার সুযোগ নেই। বিষয়টি একাধিক দলিল দ্বারাও প্রমাণিত। একই চিন্তা ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

জ. অযোগ্যদের অনুপ্রবেশ না করা

আমরা বার বার পড়ে এসেছি যে, এ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দখল রয়েছে। তাই যে কোনো ব্যক্তির অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই। একজন মুজতাহিদই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। ইমামগণ ইজতিহাদের জন্য বিভিন্ন শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। উসূলুল ফিকহ ও উসূলুল ইফতা সহ অন্যান্য কিতাবে তা উল্লেখ হয়েছে।

আমরা সহজেই বুঝতে পারবো যে, হাদীসের বর্ণনাকারী তো হাজার হাজার। কিন্তু হাদীসের মান নির্ণয়কারী ইমাম হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। সুতরাং হাদীস জানা মাত্রই 'মান' নির্ণয়ের যোগ্য হওয়া যায় না। কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে কিছু ভাই উসূলে হাদীসের সঠিক দীক্ষা গ্রহণ না করেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া শুরু করেছে। তাদের মাঝে অনেকে তো সঠিকভাবে শব্দ উচ্চারণ করতে জানে না, অথচ মুজতাহিদ বনে বসে আছে!! আবার অনেকের আচরণ থেকে মনে হয়, মদীনায় এক বা দু' বৎসর থাকলেই হাদীসের ইমাম হয়ে যায়। অবাক হওয়ার মত কর্মকাণ্ড!!
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানুষও জানে যে, প্রাজ্ঞ আলেম ছাড়া অন্য কারো কথায় কান দেয়া যাবে না।

হাদীসের 'নির্দেশনা' নির্ণয়: কিছু জটিলতা

আমরা জানি, প্রত্যেকটি হাদীস ও সংবাদের একটা নির্দেশনা আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা, কাজ ও সমর্থনÑ সবকিছুর উদ্দেশ্য হলো, উম্মাতকে নির্দেশনা প্রদান। আর নির্দেশনা অনুধাবন না করলেÑ হাদীস অনুযায়ী আমল করাও সম্ভব নয়। সুতরাং হাদীসের অনুসরণ তখনই হবেÑ যখন তার নির্দেশনা নির্ণয় করা হবে।
নির্দেশনা বুঝার পূর্বে আমাদের ঠিক করতে হবেÑ নির্দেশনার সামগ্রিক ও মূলভিত্তি হবে কীসের উপর? প্রস্তাব আসতে পারে, হাদীসের বাহ্যিক অর্থই নির্দেশনার ভিত্তি হবে; এর উপর ভিত্তি করেই হাদীসের নিদের্শনা নির্ণয় করবো এবং অনুসরণ করবো। কিন্তু এটা মৌলিকও নয়, সামগ্রিকও নয়। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না। বরং অনেক আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়ালজামাআহর ইমামগণ ঐক্যমত হয়েছেন যে, এ গুলোতে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহ. (৬০৬হি.) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'আসাসুত তাকদীস' এ একটি অধ্যায় এভাবে লিখেছেন:

®المقدمة في بيان أن جميع فرق الإسلام مُقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار

"ইসলামের সকল দল—উপদলের সর্ববাদী সম্মত স্বীকৃতি হলো, কুরআন—হাদীসের বাহ্যিক কিছু স্থানে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক"

তাঁর উল্লিখিত কিছু উদাহরণ ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত থাকলেও মূল দাবীর ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ নেই।
এ থেকেই বুঝা যায়, কুরআন হাদীসের নির্দেশনা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ সর্বদা মাপকাঠি হতে পারে না।
যা একটি স্বীকৃত বিষয়। এছাড়া সুনিপনভাবে নির্দেশনা নির্ণয় করাও সম্ভব হবে না।
পক্ষান্তরে প্রত্যেকটি হাদীসের পিছনে নির্দিষ্ট কারণ ও উদ্দেশ্য থাকে, যাকে কেন্দ্র করে হাদীসের নির্দেশনা আবর্তিত হতে থাকে। ইলমী পরিভাষায় একে 'মানাত' বলে। যেহেতু কারণ ছাড়া কোনো হাদীসই হতে পারে না। তাই কারণ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হাদীসের নির্দেশনা নির্ণয় করা হবে সর্বাধিক শ্রেয়। এতে নির্দেশনার মূল কাঠামো ফুটে উঠবে। এ ছাড়া এ পদ্ধতি সামগ্রিকও বটে। সকল হাদীসকে এর আওতায় এনে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সুতরাং হাদীসের নির্দেশনা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মৌলিক ভিত্তি হবে হাদীসের 'কারণও উদ্দেশ্য।' সংক্ষেপে আমরা এভাবে বলতে পারি "الحديث على مناطه"Ñ । 'মানাত'কে কেন্দ্র করেই হাদীসের উপর আমল করা হবে। 'মানাতের' দাবী অনুসারে কখনো হাদীসের বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে, কখনো বা অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। যেখানে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হবে, সেখানে সে হিসেবে আমল করা হবে। আর যেখানে অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্দেশ্য হবে, সেখানে সেভাবেই আমল করা হবে। কুরআনের ক্ষেত্রেও এ নীতিটি প্রযোজ্য হবে। মুফাসসিরীনে কেরাম আয়াতের 'মানাত' বুঝার সুবিধার্থে আয়াতের শানে নুযূল বিষয়ক আলোচনা করে থাকেন। বরং তা উলূমুল কুরআনের অন্যতম অংশ। আয়াতের মূল উদ্দেশ্য ও 'মানাত' নির্ণয় করার অন্যতম সহায়ক। তাইতো ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে আহমাদ ওয়াহিদী রাহ. বলেছেন:

فآل الأمر بنا إلى إفادة المبتدئين بعلوم الكتاب ، إبانة ما أُنزل فيه من الأسباب . إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها ، وأولى ما تُصرَف العناية إليها ؛ لإمتناع معرفة تفصيل الآية وقصدِ سبيلها ، دون الوقوف عَلَى قصتها وبيان نزولها®.

“তাই কিতাবুল্লাহর তালিবে ইলমদের উপকার করার লক্ষে কুরআনের শানে নুযুল নিয়ে আলোচনা করা আবশ্যক হয়ে দাড়িয়েছে। যেহেতু (কিতাবুল্লাহর মর্মোদ্ধারে) শানে নুযুলের প্রয়োজনিয়তা অধিক বেশী ও অনেক উত্তম কাজ। কারণ, আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা না জানলে আয়াতের সঠিক নির্দেশনা ও মর্মোদ্ধার সম্ভব নয়।”

ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ রাহ. বলেন:

®بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن

“আয়াতের নির্দেশনা ও মর্মোদ্ধারের ক্ষেত্রে শানে নুযুল একটি অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম।”

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহ. বলেন:

®معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب

“শানে নুযুল সম্পর্কে সম্যক অবগতি আয়াতকে সঠিকভাবে বুঝার উপলব্ধি করার একটি সহায়ক মাধ্যম।”

হাদীসের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টির প্রতি মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, মুখতালিফুল হাদীসের ফিকহে মুদাল্লাল ও ফিকহে মুকারান বিষয়ক কিতাবাদিতে বিভিন্নভাবে বিষয়টির আলোচনা হয়েছে। অনেক ইমাম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাবও রচনা করেছেন।

মোটকথা, সর্বদা সর্বক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য হবে এমনটি নয়। আর এই মূলনীতি শুধু হাদীস নয় বরং কুরআনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এই পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সাহাবা কেরাম রা. ও এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। পরবর্তী ইমামগণও তা অনুসরণ করেছেন। এমনকি সালাফীরাও বাহ্যিক অর্থের গুরুত্ব সর্বাধিক দিলেও প্রয়োজনে এ পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে। এখানে শুধু একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. মালেক বিন হুয়াইরিছের হাদীসÑ ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা থেকে কীভাবে দাঁড়াতেনÑ তার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

وقد روي عن عدة من أصحاب النبي ‘، وسائر من وصف صلاته ‘ لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد، ومالك بن الحويرث.

ولو كان هديه ‘ فعلها دائما لذكرها كل من وصف ‘، ومجرد فعله ‘ لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة.

“অন্যদিকে বহু সংখ্যক সাহাবা কেরাম রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা কেউই এ বিশ্রামের বৈঠকের কথা উল্লেখ করেননি। এ বৈঠকটি শুধুমাত্র আবু হুমাইদ এবং মালেক ইবনে হুয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে। যদি ‘বিশ্রাম—বৈঠক’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক সুন্নাহ হতো, তাহলে যারাই তাঁর নামাযের বিবরণ পেশ করেছেন, তারা সকলে অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। কেবলমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃর্ক বিশ্রামের বৈঠক হলে তা সুন্নাহ হিসেবে প্রমাণিত হয় না। তবে তিনি যদি তা উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় হিসেবে করে থাকেন, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ প্রয়োজন ছিলো বলেই তা করেছেন। আর এমনটি মেনে নিলে তা সুন্নাহ হবে না। এই দিকটিকে কেন্দ্র করেই মাসআলার মূলভিত্তি।”

সালাফী মতাদর্শের অনেক আলেমও এ বিষয়ে জোরালো আলোচনা করেছেন। হাদীসের নির্দেশনা নির্ণয়ে হাদীস বলার কারণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুরুত্ব দিয়েছেন। ড. ইউসূফ কারযাবী এর একটি আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ومن حسن الفقه للسنة النبوية: النظر فيما بني من الأحاديث على أسباب خاصة أو ارتبط بعلة معينة , منصوص عليها في الحديث أو مستنبطة منه , أو مفهومة من الواقع الذي سيق فيه الحديث.

فالناظر المتعمق يجد أن من الحديث ما بني على رعاية ظروف زمنية خاصة ليحقق مصلحة معتبرة , أو يدرأ مفسدة معينة , أو يعالج مشكلة قائمة , في ذلك الوقت.

ومعنى هذا أن الحكم الذي يحمله الحديث قد يبدو عَامًّا وَدَائِمًا , ولكنه ـ عند التأمل ـ مبني على علة , ويزول بزوالها , كما يبقى ببقائها.

لا بد لفهم الحديث فَهْمًا سَلِيمًا دَقِيقًا , من معرفة الملابسات التي سيق فيها النص , وجاء بَيَانًا لها وعلاجًا لظروفها , حتى يتحدد المراد من الحديث بدقة ولا يتعرض لشطحات الظنون , أو الجري وراء ظاهر غير مقصود.

ومما لا يخفى أن علماءنا , قد ذكروا أن مما يعين على حسن فهم القرآن معرفة أسباب نزوله , حتى لا يقع فيما وقع فيه بعض الغلاة من الخوارج وغيرهم , ممن أخذوا الآيات التي نزلت في المشركين , وطبقوها على المسلمين , ولهذا كان ابن عمر يراهم شرار الخلق , بما حَرَّفُوا كتاب الله عما أنزل فيه وأما السنة فهي تعالج كثيرًا من المشكلات الموضعية والجزئية والآنية , وفيها من الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن.

فلا بد من التفرقة بين ما هو خاص وما هو عام , وما هو مُؤَقَّتٌ وما هو خالد وما هو جزئِي , وما هو كلي , فلكل منها حكمه , والنظر إلى السياق والملابسات والأسباب تساعد على سداد الفهم , واستقامته لمن وفقه الله ®.

“নববী সুন্নাহকে বুঝার সুন্দরতম একটি পদ্ধতি হলো, হাদীসটি বিশেষ কোনো কারণের সাথে সম্পৃক্ত কি না এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ করা। চাই তা হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকুক বা ইজতিহাদ করে উদ্ভাবন বা হাদীসের প্রেক্ষাপট থেকে গ্রহণ করা হোক। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি লক্ষ করলেই দেখতে পাবে যে, কিছু হাদীস এমন রয়েছে যা নির্ধারিত স্থান কালের সাথে সম্পৃক্ত। বিশেষ কোনো মাসলাহাত বা মন্দ কাজকে প্রতিহত করা বা সমস্যার সমাধানের সাথে হাদীসটি সম্পৃক্ত। অর্থাৎ কখনো (বাহ্যিকভাবে) হাদীস ব্যাপক ও স্থায়ী বিধানের অর্থ বহন করে, কিন্তু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে ফুটে উঠে যে, এটা বিশেষ একটি কারণের সাথে সম্পৃক্ত। যার অনুপস্থিতিতে এর উপর আমল করা যায় না। হাদীসকে সঠিক ও সুক্ষভাবে অনুধাবন করতে হলে হাদীসের পটভুমি বা প্রেক্ষাপট, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগতি অত্যন্ত জরুরী। যেন হাদীসের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় এবং বিভিন্ন ভুল অনুমান, উদ্দেশ্যহীন বাহ্যিক অর্থ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

প্রকাশ্য যে, উলামা কেরাম বলে থাকেন, কুরআনকে সঠিক সুন্দর করে বুঝার ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক হলো, আয়াতের পটভুমি ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগতি লাভ। যেন কট্টরপন্থী খারেজীদের মত ভুলের স্বীকার না হয়। তারা মুশরিকীনদের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ আয়াত সমুহকে মুসলামনগণের উপর প্রয়োগ করে থাকে। এ কারণেই হযরত ইবনে ওমর রা. তাদেরকে সৃষ্টির মাঝে নিকৃষ্ট জাতি মনে করতেন। কারণ, তারা অপপ্রয়োগ করে আয়াতের বিকৃতি সাধন করেছে। আর সুন্নাহর মাঝে স্থান, কাল, পাত্র হিসেবে এ সমস্ত সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। সুন্নাহর মাঝে খাছ (নির্ধারিত) ও বিশদ বিবরণ থাকে যা কুরআনে নেই। তাই কোনটি ব্যাপক অর্থবহ আর কোনটি নির্দিষ্ট অর্থবহ এর মাঝে পার্থক্য করতে হবে। এবং এ পার্থক্য করতে হবে, কোনটি সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ কোনটি স্থায়ী, কোনটি ব্যাপক কোনটি আংশিক। প্রত্যেকটির হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। হাদীসের প্রেক্ষাপট ও পারিপার্শ্বিক সমুহ বিষয় এ ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক। আল্লাহ যাকে বিষয়গুলো বুঝার তাওফীক দান করেন সেই একমাত্র সঠিকের উপর অটল থাকতে পারে।”

নির্দেশনা নির্ণয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সাহাবা কেরামগণের সামনে কুরআন—হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন। নির্দেশনা নির্ণয়ের পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি সর্বদা বাহ্যিক অর্থই নিতে হবেÑ এমনটি বলেননি। তিনি নিজেও অনেক হাদীসে ইঙ্গিত করেছেন, ‘এখানে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়’Ñ এখানে নির্দেশনা স্থির করতে হবে

‘মানাতে’র আলোকে; বাহ্যিক অর্থের আলোকে নয়। হাদীসসমূহে প্রচুর উদাহরণ আছে। ফকীহ হাদীস ব্যাখ্যাকারীদের নিকট বিষয়টি প্রসিদ্ধ। তারপরেও স্বরণ করে দেওয়ার জন্য আমরা কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি,

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন মিম্বরে উঠে বললেন, “اجلسوا (তোমরা বসে যাও!)”। হযরত ইবনে মাসউদ রা. (৩২হি.) এখনো মসজিদে প্রবেশ করেননি। তিনি বাণী শোনামাত্রই যেখানে ছিলেনÑবসে পড়লেন। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

تعال ياعبد الله بن مسعود.

“চলে এসো, হে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ!”

লক্ষ করে দেখুন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. প্রথমে হাদীসের বাহ্যিক অর্থ আমলে নিয়ে নির্দেশনা পালন করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভিতরে আসতে বলে ইঙ্গিত করলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো, ‘যারা মসজিদের অভ্যন্তরেÑ তারা বসবে’। তাহলে বাহ্যিক অর্থ ছিলো অনেক ব্যাপক, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো, নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা নামাযের মাঝে জুতা খুলে বাম পার্শ্বে রাখলেন। সাহাবা কেরাম রা. তা লক্ষ করে নিজেরাও জুতা খুলে রাখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা জুতা কেন খুললে? তাঁরা প্রতিউত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে খুলতে দেখে আমরাও জুতা খুলেছি।

এখানে সাহাবা কেরাম রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক অবস্থাকেই অনুসরণ করেছেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিক্ষা দিলেন যে, এখানে বাহ্যিক অনুসরণ উদ্দেশ্য নয়। বরং এর পিছনে একটি কারণ বা ‘মানাত’ রয়েছে। যা পাওয়া গেলেই এ নির্দেশনা আমলে নিতে হবে, অন্যথায় নয়। তাই তিনি বললেন:

إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظُر، فإن رأى ر: إن جبريلَ عليه السلام أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قَذَرا وقال ر®في نَعليه قَذَراً أو أذًى فليمسحه وليُصل فيهما

“জিরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে এসে জানালেন যে, আমার পাদুকাদ্বয়ে নাজাসাত ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা মসজিদে প্রবেশের পূর্বে ভালোভাবে নিজেদের জুতা দেখবে, যদি কোনো ময়লা চোখে পড়ে তখন তা পরিস্কার করে মসজিদে প্রবেশ করবে। এবং জুতা পরে নামায পড়বে।”

অনুরূপ ঘটনা আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. এর সাথে ঘটেছে।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ر® ولا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء

“পরলৌকিকতায় যে তার কাপড় হেঁচড়ে হাটে আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।।”

আবু বকর সিদ্দীক রা. (১৩হি.) হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। কারণ, বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নিলে তিনিও হাদীসের সতর্ককবাণীর আওতায় পড়ে যাচ্ছেন। তাই পেরেশান হয়ে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বসলেন:

يا رسول الله، إن أحد شقي ثوبي يسترخي ، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟!

“ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাপড়ের এক অংশ ধরে না রাখলে মাটিতে পরে যায়।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করলেন, এখানে ‘নির্দেশনা’Ñ বাহ্যিক অর্থের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং ‘মানাত’ এর সাথে সম্পর্কিত। ‘মানাত’ হিসেবে তুমি এর আওতায় পড়ো নাÑ

إنك لست تصنع ذلك خيلاء ر®.

“তুমি পরলৌককারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত নয়।”

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

انصر أخاك ظالما أو مظلوما.

"সাহায্য করো তোমার ভাইকেÑ মাজলুম হোক কিংবা জালিম।"
এই বাণীর বাহ্যিক অর্থ হিসেবে নির্দেশনা দাঁড়ায়, 'জালেমেরও সঙ্গ দাও; তাকেও সাহায্য করো!'Ñ অথচ তিনি এই উদ্দেশ্যে বলেননি, এই নির্দেশনাও দেননি! তাই সাহাবা কেরাম রা. প্রথমে 'বাহ্যিক অর্থ' নিয়ে 'খটকায়' পড়ে গেলেন। সংশয় নিরসনের জন্য তারা ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন:
قالوا :يا رسول الله، هذا ينصره مظلوما، فكيف ينصره ظالما،
"হে আল্লাহর রাসূল! মাজলুমকে সাহায্যের ব্যাপারটা তো বুঝা গেলো, কিন্তু 'জালিম'কে সাহায্য করার মানেটা কী?
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলাসা করলেন:
ব্র يكفه عن الظلم®.
"জালিমকে সাহায্যের অর্থ হলো, তাকে জুলুম থেকে বাধা দিবে।"
৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
ব্র ليس من البر الصوم في السفر®
"সফরাবস্থায় রোযা রাখা নেকী বা পুণ্যের কাজ নয়।"
বাহ্যিক অর্থ হলো, সফরাবস্থায় রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়। সুতরাং রোযা রাখা যাবে না। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সফরে রোযা রেখেছেন। হাদীসটির বাহ্যিক অর্থে ব্যাপকতা থাকলেও মূলত ব্যাপকতা উদ্দিষ্ট নয়। আর এখানে বাহ্যিক অর্থের উপর ভিত্তি করে নির্দেশনা নির্ণয় করা যাবে না। এ বাক্যের মূল কারণ ও 'মানাত' হাদীসের ভাষ্যেই প্রস্ফুটিত হয়েছে। এর ভিত্তিতেই নির্দেশনা নির্ণয় করতে হবে।
ব্র :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟®، فقالوا: صائم، فقال: ব্র ليس من البر الصوم في السفر®.
"একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক সফরে একজনকে কে নিয়ে লোকদের মাঝে ভিড় লক্ষ করলেন। তখন তিনি বললেন, কী হয়েছে এখানে? উত্তরে তারা বললেন, সে রোযা রেখেছে (তাই তার শরীরের অবস্থা সুবিধাজনক নয়)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সফরাবস্থায় রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয়।"
এছাড়া আরো অনেক হাদীস রয়েছেÑ যেখানে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইঙ্গিত করে গেছেন। এবং এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন, নিদের্শনার ভিত্তি হবে 'মানাত'। সাহাবা কেরাম এই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন।
সাহাবা কেরাম রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সর্বদা সর্বক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না। তাই তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে মুবারক থেকে হাদীস শুনার পরও অন্য দলিলের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন। কখনো বা জিজ্ঞাসা করেছেন, হেতু বা উৎস সম্পর্কে। যাতে করে আমল করা—না করার বিষয়টিও নির্ণয় করা যায় বা প্রয়োজনে পরামর্শ যোগ করা যায়। এর উদাহরণও হাদীসের কিতাবগুলোতে অনেক। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি,
১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরাম রা.দের এক জামাতকে বানূ কুরায়যা নামক স্থানে পাঠালেন, এবং তাঁদের নির্দেশ করেছিলেন:
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة.
"তোমাদের কেউ যেন বনূ কুরায়যায় না পেঁৗছে আসরের নামায না পড়ে।"
সাহাবা কেরাম রা. রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে আছর নামাযের সময় হলো। তাঁদের মাঝে এক জামাত বললেন, আমরা বানূ কুরায়যা না পেঁৗছে নামায পড়ব না; যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। অপর এক জামাত বললেন, আমরা এখানেই নামায আদায় করে নিব। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য নামায কাযা করা নয়। বরং খুব দ্রুত পেঁৗছে যাওয়া।
بل نصلي، لم يرد من ذلك

“বরং আমরা এখানে পড়ে নেই। আমাদের কে দ্রুত যাওয়ার জন্য তিনি ঐ কথাটি বলেছিলেন।”

তাহলে লক্ষ করুন! এ সমস্ত সাহাবা কেরাম রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে নির্দেশ শুনলেন। কারো মাধ্যমে নয়; বরং সরাসরি তাঁর পাক যবান থেকেই। এরপরও তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেননি। তাহলে তাঁরা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হয়ে গেলেন? হুকুম অমান্য করলেন? তাঁরা কি হাদীস বাদ দিয়ে ‘কিয়াস’ করলেন? কোনোটিই করেননি। বরং তাঁদের ক্ষেত্রে এমন ধারণা মুমিনের মুখে শোভা পাওয়ার কথা নয়। এ ছাড়া স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের এ কথাকে সমর্থন করেছেন। এতেও বুঝা গেলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর সর্বদা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না। এ সকল সাহাবা কেরাম রা. এর প্রতি কি এ আয়াত পেশ করা যাবে:

{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}

“আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো ফায়সালা দান করেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন এখতিয়ার বাকী থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হল।”

বরং চরম দৃষ্টতার পরিচায়ক হবে!! তাহলে দেখুন, সাহাবা কেরাম রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে হাদীস শুনে প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থন পেয়েছেন। পরবর্তী ইমামগণসহ মুসলমানগণ সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনেননি; হাঁ! বিভিন্ন মাধ্যমে শুনা হয়েছে যাতে ‘ইখতিলাফের’ সুযোগ আছে। এ সকল ইমামগণ যখন অন্যান্য দলিলের আলোকে কোনো হাদীসকে ব্যাখ্যা করেন। তখন লা—মাযহাবী ও সালাফী ভাইয়েরা বিভিন্ন অপবাদ রটাতে থাকে। এমনকি উল্লিখিত আয়াতও শুনাতে কুণ্ঠাবোধ করে না! তাদের স্বরণ রাখা উচিত যে, (যারা কাফেরদের ক্ষেত্রে নাযিলকৃত আয়াতকে মুসলমানদের উপর বাস্তবায়ন করে তারা খারেজী। (সহীহ বুখারী [৬৯৩০])

মোটকথা, এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দাড়ায়, আজকের আসর নামায বনূ কুরাইযায়ই পড়তে হবে। রাস্তায় পড়া যাবে না। কিছু সাহাবা সে হিসেবেই আমল করেছেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য হলো, খুব দ্রুত যাওয়া। নামায কাযা করা নয়। অন্যান্য সাহাবা রাস্তায় নামায আদায় করেছেন। তাই তাঁরা বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায বাদ দিতে বলেননি। বরং দ্রুত যেতে বলেছেন।

২. বারীরা রা. এর হাদীস

শরীয়তের নিয়ম হলো, বিবাহিত গোলাম বা বাদী আযাদ হলে পূর্বের বিবাহ বিচ্ছেদ করার অধিকার রাখে। হযরত বারীরা রা. বিবাহিতা বাদী ছিলেন। তিনি আযাদ হওয়ার পর তাঁর পূর্বেকার স্বামী মুগীছ রা. থেকে বিচ্ছেদ গ্রহণ করেন। কিন্তু মুগীছ রা. এ বিচ্ছেদে রাযী ছিলেন না। তাঁর ব্যাকুলতার অবস্থা দেখে মায়ার নবী এক পর্যায়ে বারীরা রা. কে বলেন:

®لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع، قالت: لا حاجة لي فيه

“যদি তুমি তাকে গ্রহণ করে নিতে? বারীরা রা. বললেন, আপনার আদেশ হলে হতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না আমি সুপারিশ করছি মাত্র। বারীরা রা. বললেন, তাকে আমার প্রয়োজন নেই।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারিরা রা.কে বলেছেন মুগীছকে গ্রহণ করার জন্য। যদি বাহ্যিক অর্থই সর্বদা উদ্দেশ্য হত, তাহলে বারীরা রা.এর জন্য গ্রহণ করাই কর্তব্য হয়ে দাড়াতো। কিন্তু তাঁরা জানতো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার কখনো বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হয়, কখনো অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্দেশ্য হয়। তাই বারীরা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি আপনার নির্দেশ না পরামর্শ ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলেছেন, না এটা আমার পরামর্শ; তখন তিনি তা গ্রহণ করেননি। যেহেতু ঐচ্ছিক বিষয়টি ছিল। আর তাঁর উযরও ছিলো। এর কাছাকাছি আরো একটি ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধে একস্থানে সাহাবাদেরকে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন হযরত হাব্বার বিন মুনযির রা. বলেন:

أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل الرأي ﴿ والحرب والمكيدة، فقال: يا رسول الله! فإن هذا ليس بمنزل...﴾

"এ স্থানে অবস্থান কি আল্লাহ তাআলার হুকুমে যা তামীল করা অত্যাবশ্যকীয় না নিজস্ব যুক্তি বা যুদ্ধের কৌশলগত কোনো বিষয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, বরং নিজের রায় বা যুদ্ধের কৌশলগত বিষয়। তখন সাহাবী বললেন, এ স্থানটি...।"

আমরা বুঝতে পারলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনার পরও সাহাবীগণ সঠিক নির্দেশনা জানার উদ্দেশ্যে পূনরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাছে কী চাওয়া হচ্ছে? তাহলে হাদীস শুনার পর মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী নির্দেশনা দিচ্ছেন তা খুঁজে বের করা এবং সে হিসেবে আমল করা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সমর্থিত পদ্ধতি। এটিকে অস্বীকার করা বা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

আরো একটি উদাহরণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা. কে একজন ব্যক্তির উপর 'হদ' কায়েম করার নির্দেশ দিলেন:

﴿إذهب فاضرب عنقه﴾

"যাও তার গর্দান উড়িয়ে দিয়ে আস!"

হযরত আলী রা. তাঁর নিকট এসে দেখলেন, সে 'মাজবুব'। তখন আর 'হদ' কায়েম করেননি।

﴿فأتاه علي —رضي الله عنه—، فإذا هو مجبوب، ليس له ذكر، فكف علي —رضي الله عنه— عنه﴾

"আলী রা. এসে দেখলেন সে একজন মাজবুব ব্যক্তি যার পুরুষাঙ্গ নেই। তখন তিনি হদ প্রয়োগ না করে ফিরে আসলেন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম ও কাযী হিসেবে ফায়সালা করলেন তার হদ কায়েম করার জন্য। কিন্তু হযরত আলী রা. তা না করে ফিরে আসলেন। অথচ বাহ্যিক অর্থ হিসেবে করা আবশ্যক ছিলো। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, হদ কায়েম করার 'মানাত—কারণ' এখানে নেই, তখন তিনি বিরত থাকলেন। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করে প্রশংসা কুড়ালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন:

﴿أحسنت ، الشاهد يرى مالا يرى الغائب﴾

"খুবই উত্তম একটি কাজ করেছ। প্রত্যক্ষদর্শী বাস্তবতা সম্পর্কে ভালো জানতে পারে যা অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না।"

অনুরুপ আরো একটি ঘটনা ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ রাহ. বর্ণনা করেছেন।

এখানে আমরা দেখলাম, হযরত আলী রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীকে 'মানাতের' ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে আমলে নিয়েছেন।

মোটকথা, সাহাবা কেরামের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণের আবেগ ও আগ্রহ আমাদের চে' হাজার গুণ বেশী ছিলো। বরং তুলনাই করা যায় না। তারাই তার বাণীর নির্দেশনা এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, হাদীস সর্বদা 'বাহ্যিক' অর্থে হয় না। বরং 'মানাত' খুঁজে বের করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরও তারা এভাবে আমল করেছেন।

বিশেষকরে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তিনি ভালোভাবে জানতেন, সব হাদীসের নির্দেশনা এক পর্যায়ের নয়। এমনিভাবে সব হাদীসকে বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করা যাবে না। তাই তিনি এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। সাহাবা কেরামকে প্রয়োজন ছাড়া মদীনার বাহিরে যেতে দিতেন না। যেন তাঁরা মদীনাতেই হাদীস বর্ণনা করে আর তিনি বিচার করতে পারেন কোনটির কী নির্দেশনা; কিভাবে আমল করতে হবে। এমনিভাবে তিনি হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধান হতে বলেছেন বারংবার। তিনি বলেন:

®أحرج بالله على رجل روى حديثاً العمل على خلافه®

"শপথ আল্লাহর! আমলের বিপরীত হাদীস বর্ণনাকারীর প্রতি আমার সঙ্কোচ বোধ হয়।"

খতীব বাগদাদী রাহ. (৪৬৩হি.) সুন্দরই বলেছেন:

إن قال قائل: ما وجه إنكار عمر على الصحابة روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديده عليهم في ذلك؟ قيل له: إنما فعل ذلك عمر احتياطا للدين، وحسن نظر للمسلمين. لأنه خاف أن ينكلوا عن الأعمال ويتكلوا على ظاهر الأخبار، وليس حكم جميع الأحاديث على ظاهرها، ولا كل من سمعها عرف فقهها. فقد يرد الحديث مجملا، ويستنبط معناه وتفسيره من غيره. فخشي عمر أن يحمل حديث على غير وجهه، أو يؤخذ بظاهر لفظه والحكم بخلاف ما أخذ به.

"যদি কেউ বলে, হযরত ওমর রা. সাহাবা কেরাম রা. এর উপর হাদীস বর্ণনার উপর এ পরিমাণ কঠোরতা প্রদর্শন করলেন কোন যুক্তিতে? উত্তরে তাকে বলা হবে, একমাত্র দীনকে নিষ্কলুষ ও হিফাযাত ও মুসলমানদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বাকী রাখার স্বার্থেই তার এ পদক্ষেপ গ্রহণ। কারণ, তিনি আশঙ্কা করেছেন, তারা হয়তো হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর ভরসা করে আমল থেকে সরে আসতে পারে। কারণ, সব হাদীসে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। আর প্রত্যেক হাদীস শ্রবণকারী তো মর্মোদ্ধারে পারদর্শী নয়। হাদীস কখনো খুবই সংক্ষিপ্ত অর্থবহ হয়ে থাক। তাই তিনি হাদীসের অপপ্রয়োগ তথা সঠিক স্থানে হাদীস প্রয়োগ না করে ভিন্ন স্থানে প্রয়োগ বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ অথচ হুকুম তার বিপরীত এ বিষয়টির আশঙ্কা করেছেন। (তাই এ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন)"

হযরত ওমর রা. একজন খলীফা হিসেবে এ অবস্থান গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য সাহাবাও তা গ্রহণ করেছেন; কেউই কোনো প্রকারের আপত্তি তুলেননি। বরং হযরত মুআবুয়া রা. ঘোষণা করে দিয়েছেন যে,

®أيها الناس! إياكم وأحاديث رسول الله ، إلا حديثا كان يذكر على عهد عمر رضي الله عنه®

"হে লোকসকল! হযরত ওমর রা. এর যামানায় পরিচিত হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করো।"

এখান থেকে সহজেই অনুমেয়, হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে নয় 'মানাতের' উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা হবে।

সংখ্যাগরিষ্ট সাহাবা হাদীসের নির্দেশনা নির্ণয়ে এ নীতি অবলম্বন করেছেন। সালাফী আলেম ড. ইউসূফ কারযাভী সাহেব বলেন:

® وهذا المنهج في النظر إلى ملابسات الأحاديث إلى العلل التي سيقت لها , قد سبق به الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان.

فقد تركوا العمل بظاهر بعض الأحاديث , حين تبين لهم أنها كانت تعالج حالة معينة في زمن النبوة , ثم تبدلت تلك الحال عما كانت عليه®.

"হাদীসের প্রেক্ষাপট, পারিপার্শ্বিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমুহ লক্ষ করা সাহাবা কেরাম রা. এর মানহাজ ছিলো। তাঁরা অনেক হাদীসের বাহ্যিক অর্থকে পরিহার করেছেন যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে, এগুলো নববী যামানার নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। আর এ সমুহ অবস্থা এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না।"

পরবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণ এ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। এমনকি যারা বাহ্যিক অর্থকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তারাও ক্ষেত্রবিশেষ এ নীতির উপর আমল করে থাকেন।

নির্দেশনা নির্ণয়ে মতভেদ

হাদীসের নির্দেশনা নির্ণয় সম্পর্কে আমরা প্রাথমিক ধারণা লাভ করলাম। আরো একটি বিষয় মনে রাখলে সামনের আলোচনা বুঝতে সহজ হবে।

হাদীসের নির্দেশনা দু'ধরণের:

এক. অকাট্য

কুরআনের ভাষায় যাকে ‘বাইয়্যিনাত’ বলা হয়। এবং হাদীস ও উসূলুল ফিকহের পরিভাষায় একে ‘মুহকাম’ বলা হয়। এ ধরণের অকাট্ট নির্দেশনার ক্ষেত্রে পূরো উম্মাহ একমত পোষণ করে থাকেন। কোনো দ্বিমত থাকে না। কেউ দ্বিমত পোষণ করলেও তা পরিত্যাজ্য হবে।

দুই. সম্ভাবনাপূর্ণ

আমরা জেনেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ব্যাপকভাবে কথা বলতেন। আর ব্যাপক নির্দেশনা থেকে সুনির্দিষ্ট বিধান অকাট্টভাবে বের করা যায় না। বরং তা সম্ভাব্য হয়ে থাকে। আর এ ধরণের সম্ভাব্য নির্দেশনার ক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে ইখতিলাফও দেখা দেয়। আমরা পিছনে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. এর কথা পড়ে এসেছি। এখানে আবারো উল্লেখ করছি।

®فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثير

“বহু হাদীস এমন আছে যা বিশুদ্ধ কিন্তু তার অর্থে রয়েছে অনেক মতানৈক্য।”

উপরোল্লিখিত দিকের পাশাপাশি এ দিকটিও হাদীসের মাঝে বেশ জটিল। এ বিষয়ে সমাধান দিতে ইজতিহাদের প্রয়োজন হয়। সাধারণরা কোনো সমাধান দেওয়ার অধিকার রাখে না। আহলে হাদীস সালাফী ভাইয়েরা যে সকল হাদীস দিয়ে দলিল দিয়ে থাকে। তার অধিকাংশই এ আওতায় পড়ে।

হাদীসের নির্দেশনায় জটিলতা: আমাদের করণীয়

হাদীসের নির্দেশনা জনিত বিভিন্ন জটিলতা যার কিছুটা আমরা দেখলাম। এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী হবে তা হাদীস ও ফিকহের ইমামদের উসূল ও নীতির আলোকে এখানে তুলে ধরছি।

ক. সর্বদা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না

আমরা পূর্বে জেনেছি যে, নির্দেশনা নির্ণয় হবে ‘মানাত’ ভিত্তিক। বাহ্যিক অর্থ সর্বদা উদ্দেশ্য হবে না। যারা আমাদের দেশে হাদীসের নামে অপপ্রচার চালিয়ে থাকে, তারা এ বিষয়টির কোনোই তোয়াক্কাই করে না। হাদীসকে সামগ্রিকভাবে না দেখে কোনো একটি শব্দ বা বাক্য নিয়ে অপপ্রচার শুরু করে। যা পরিহার করা অপরিহার্য।

আমরা সর্বদা হাদীসের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো। এক্ষেত্রে বিজ্ঞজনের শরণাপন্ন হবো।

খ. হাদীসের অর্থ ফুকাহা কেরাম থেকে গ্রহণ করা

আমরা পিছনের আলোচনায় জানতে পেরেছি যে, হাদীসের ‘মানাত’ নির্ণয় করা এবং সম্ভাব্য অর্থ স্থির করা জটিলতম কাজ। যা একজন মুজতাহিদই আঞ্জাম দিতে পারেন। এছাড়া আমাদের জানা কথা যে, হাদীসের শব্দ মুখস্থ করলেই হাদীসের অর্থও বুঝা আবশ্যক নয়। আমাদের দেশে অনেক কুরআনের হাফিয আছে, যারা কুরআনের অর্থ জানে না। এমনিভাবে ভাষা বুঝলেই নির্দেশনা বুঝা আবশ্যক নয়। অন্যথায় তো আরব দেশে ঘরে ঘরে মুজতাহিদ জন্ম নিত! তাই হাদীসের হাফিয হওয়া, আর হাদীসের অর্থ সম্পর্কে পারদর্শী হওয়া এক নয়। অনেক হাফিযুল হাদীস আছেন যারা হাদীস থেকে বিধান আহরণের ক্ষেত্রে পারদর্শী না। হাদীসের অর্থের ক্ষেত্রে পারদর্শী হলেন মুজতাহিদ ফকীহগণ।

ইমাম আমাশ রাহ. (১৪৮হি.) আবু হানীফা রাহ. (১৫০হি.) কে লক্ষ করে বলেন:

®أنتم الأطباء ، ونحن الصيادلة

“তোমরাই হলে চিকিৎসক। আর আমরা হলাম ঔষধ বিক্রেতা।”

ইমাম শাফেঈ রাহ. (২০৪হি.) কিছু মুহাদ্দিসকে লক্ষ করে বলেন:

® أنتم الصيادلة ونحن الأطباء

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহ. (২৪১হি.) মুজতাহিদ সম্পর্কে বলেন:

®كان الفقهاء أطباء ، والمحدثون صيادلة

ইমাম তিরমিযী রাহ. (২৭৯হি.) ‘মাইয়্যেতের’ গোসল প্রসঙ্গ এক আলোচনায় বলেন:

وكذلك قال الفقهاء و هم أعلم بمعاني الحديث،

“এমনটি ফুকাহা কেরাম বলেছেন। আর হাদীসের অর্থের ক্ষেত্রে তারা অধিক জ্ঞাত।”

সুতরাং তাদের থেকেই হাদীসের অর্থ নিতে হবে। বড় বড় হাফিযুল হাদীস তাদের থেকেই গ্রহণ করতেন। যেমন,

ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহ. (১৯৮হি.) বলেন:

الحديث مضلة إلا للفقهاء

“ফুকাহা ব্যতীত অন্যদের (নিজ বুঝ অনুসারে) হাদীস অনুসরণ বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার কারণ।”

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রাহ. বলেন:

نظر مالك إلى العطاف بن خالد، فقال مالك: بلغني أنكم تأخذون من هذا! فقلت: بلى. فقال: ما كنا نأخذ إلا من الفقهاء®.

“ইমাম মালেক রাহ. আত্তাফ ইবনে খালেদ রাহ. কে লক্ষ করে বললেন, জানতে পারলাম তোমরা না কি (সরাসরি) হাদীস অনুসরণ কর? উত্তরে তিনি বললেন, জী হা! ইমাম মালেক রাহ. তখন বললেন, আমরা ফুকাহা কেরাম রাহ. এর ব্যাখ্যা অনুসারেই হাদীস অনুসরণ করে থাকি!”

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আবুয যিনাদ আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান রাহ. (১৩১হি.) বলেন:

إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه و الثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آيَ القرآن®.

“আমরা হাদীস ফকীহ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করতাম। এবং তাদের থেকে কুরআনের আয়াত শিখার মত হাদীস শিখতাম।”

এছাড়া আরো অনেক হাফিযুল হাদীসগণ আমলের ক্ষেত্রেও কোনো কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদ ও ব্যাখ্যা অবলম্বন করে চলতেন। এবং সে অনুযায়ী ফাতাওয়াও প্রদান করতেন।

বিশিষ্ট হাফিযুল হাদীস ওয়াকী’ ইবনুল জার্‌রাহ রাহ. তিনি ইমাম ইমাম আবু হানীফা রাহ. (১৫০হি.) এর মতানুসারে ফতোয়া দিতেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রাহ. বলেন:

يفتي بقول أبي حنيفة®

“তিনি ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর মতানুসারে ফতোয়া দিতেন।”

প্রখ্যাত হাফিযুল হাদীস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান রাহ.। তিনি নিজেই বলেছেন:

لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله®.

“আল্লাহ সাক্ষী আমি মিথ্যা বলছি না আবু হানীফার চে’ অধিক উত্তম মতামত বিশিষ্ট ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। আমরা তাঁর অধিকাংশ মত গ্রহণ করে থাকি।”

তাঁর সম্পর্কে তারই শাগরিদ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রাহ. বলেন:

كان يفتي أيضا بقول أبي حنيفة®.

“তিনিও আবু হানীফার মতানুসারে ফতোয়া দিতেন।”

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রাহ. (২৩৩হি.) বলেন:

القراءة عندي قراءة حمزة، والفقه فقه أبي حنيفة، وعلى هذا أدركت الناس®.

“আমি হামযা রাহ. এর পদ্ধতি অনুসারে কিরাত ও আবু হানীফার ফিকহ গ্রহণ করে থাকি। এবং লোকদেরকে এরূপ করতে দেখেছি।”

ইবনে মাঈন রাহ. এর বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, অন্য মুহাদ্দিসীনগণও আবু হানীফা রাহ. এর ইজতিহাদ অবলম্বন করতেন।

হাদীসের জগতে আরেক ইমাম আবদুর রাহমান মাহদী রাহ. (১৯৮হি.)। তাঁর সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী রাহ. (৪৫৮হি.) বর্ণনা করেন:

كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول ৃ
الرسالةৃ الأخبار، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ، فوضع له كتاب®.

"আবদুর রাহমান ইবনে মাহদী ইমাম শাফেঈ রাহ. এর নিকট পত্র লিখে পাঠালেন যে, তার জন্য কুরআনের মর্মার্থ, খবার গ্রহণ করার পদ্ধতি, ইজমাহর প্রামাণিকতা, নাসেখ—মানসূখের বিবরণ সম্পর্কিত একটি কিতাব রচনা করা জন্য। তখন তিনি তার এ অনুরোধের উত্তরে 'আর রিসালা' কিতাবটি রচনা করেন।"

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রাহ.। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসূফ রাহ. (১৮২হি.) বলেন:

ৃسفيان الثوري أكثر متابعة لأبي حنيفة®.

"সুফিয়ান ছাওরী রাহ. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবু হানীফার সহমত পোষণ করেন।"

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রাহ. (২৩৪হি.) বলেন:

ৃسفيان الثوري كان يذهب ويفتي بفتواهم®.

"সুফিয়ান ছাওরী রাহ. ইবনে মাসঊদ রা. এর শাগরিদগণের মতানুসারে আমল করেন ও ফতোয়া প্রদান করেন।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহ. (২৪১হি.) বলেন:

ৃإذا جاءت مسألة ليس فيها أثر فأفتِ فيها بقول الشافعي، رضي الله عنه®.

"যে সমস্ত মাসআলায় স্পষ্ট হাদীস পাওয়া যাবে না সে ক্ষেত্রে তুমি ইমাম শাফেঈ রাহ. এর মতানুসারে ফতোয়া প্রদান করবে।"

হাফিযুল হাদীসগণের মাঝে কেউ তো ইমাম আবু হানীফা রাহ. প্রতি সন্তুষ্ট না থাকলেও প্রয়োজনে শরঈ সমাধানের জন্য তাঁর নিকট যেতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন, ইমাম ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ রাহ. তাঁর এক হাফিযুল হাদীস প্রতিবেশীর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। সারসংক্ষেপ হলো, প্রতিবেশী লোকটি তার সহধর্মিনীকে অত্যন্ত মাহাব্বাত করত। একদিন সামান্য একটু কথা কাটাকাটি... ঝগড়া; এক পর্যায়ে 'তালাক' পর্যন্ত গিয়ে পৌছল! এমনকি সে বলল, আজ রাতেই যদি তুমি আমার নিকট তালাক না চাও, আর আমি তালাক না দিলেও তুমি তালাক.....। এরপর রাতেই তারা আমার (ওয়াকী' রাহ.) নিকট আসলো বিষয়টির সমাধানের জন্য। কিন্তু সমাধান জানাতে আমি অক্ষমতা প্রকাশ করে বললাম, চলো এই শায়খ তথা আবু হানীফার নিকট যাই। কিন্তু প্রতিবেশী লোকটি আবু হানীফার প্রতি বিরোপ মন্তব্য পোষণ করত। সবশেষে তাঁর নিকট যাওয়া হলো। তিনি এর একটি উপায় বের করে দিলেন, যার মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহর নিকট ধরা ও বিবাহ বিচ্ছেদ উভয়টি থেকেই নিস্কৃতি পেলো।

সহীহ বুখারী অধ্যয়ন করলেই প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী রাহ. (২৫৬হি.) অধ্যায় লিখার পর সাহাবা তাবেঈর ফাতাওয়া উল্লেখ করেছেন। তারপর হাদীস উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী রাহ. এরূপ উপস্থাপনের দ্বারা কী বুঝাতে চাচ্ছেন? একটু চিন্তা করলেই পরিস্কার বুঝে আসে যে, হাদীসের নির্দেশনার ক্ষেত্রে সাহাবা ও তাবেঈর ফাতাওয়া দেখার প্রয়োজন আছে। বিশেষকরে ব্যাপক অর্থবোধক হাদীসের ক্ষেত্রে তাদের ফাতাওয়া দেখা তো ইমাম বুখারী রাহ. এর স্বতন্ত্র উসূল ও নীতি। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন:

ৃومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عاما وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به®

"ইমাম বুখারী রাহ. এর একটি নীতি হলো, ব্যাপক অর্থবোধক বিশিষ্ট দলিলের কোনো এক অংশের উপর কিছু উলামা কেরামের আমল পেলে তিনি ঐ মতটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।"

সর্বোপরি আমাদের করণীয় হলো, কোনো বিধান সম্বলিত হাদীস আমাদের সামনে আসলে আমাদের দেখতে হবে যে, এ হাদীসের কোনো ব্যাখ্যা মুজতাহিদ ইমামগণ করেছেন কি না। এ পদ্ধতি অনুসরণ করলেই আপনি নিরাপদে হাদীস অনুসরণ করতে পারবেন। আপনি পদস্খলনের শিকার হবেন না। কিন্তু লা—মাযহাবীরা এর কোনো তোয়াক্কাই করে না। আল্লামা আমীন ছফদার রাহ. (১৪২১হি.) লা—মাযহাবী থেকে হানাফী হওয়ার জবানবন্দীতে লা—মাযহাবীদের চিন্তা ও সঠিক চিন্তাকে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

اب میں اعلاء السنن اور حضرت مولانا محمد حسن صاحب محدث فیض پوری کی کتاب ستہ ضروریہ الدلیل المبین وغیرہ کا مطالعہ کرتا، لیکن ابھی ذہن سے غیر مقلدیت نکل نہیں رہی تھی۔ کوئی فقہ کا مسئلہ دیکھتا تو اس کے لئے حدیث کی تلاش میں بھاگتا۔ کئی ماہ بعد پھر ذہن نے پلٹا کھایا اب اگر کوئی آیت یا حدیث پڑھتا تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ اس کا جو مطلب ذہن میں آیاہے وہ مرزا قادیانی کی طرح نیاہی ہے یا اکابر اور اسلاف نے بھی یہی مطلب سمجھا ہے تو اب خود رائی اور خود بینی کی بیماری ذہن سے نکلی اور غیر مقلدیت کا روگ دل سے رخصت ہوا اور میں اہلسنت والجماعت حنفی مسلک پر جم گیا۔

"বর্তমানে আমি ইলাউস সুনান ও মাও. মুহাম্মাদ হাসান মুহাদ্দিসে ফয়েযপুরী সহেবের 'সিত্তায়ে যরুরিয়্যা আদদালিলুন মুবীন' মুতালাআ করছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চিন্তা থেকে 'গাইরে মুকাল্লিদিয়্যাত' তথা লা—মাযহাবী চিন্তাকে বের করতে পারছি না। ফিকহের কোনো মাসআলা সামনে আসলে এর প্রমাণ হিসেবে হাদীস আছে কি না তার পিছনে পেÍ যাই। কিছু মাস পর চিন্তায় আমূল পরিবর্তন আসে। বর্তমানে কোনো আয়াত বা হাদীস পড়লে এই প্রশ্ন মনে জাগে যে, আমি যে অর্থ বুঝছি তা কি মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ন্যায় নবউদ্ভাবিত বিচ্ছিন্ন বুঝ না আকাবির আসলাফের কেউ এমন বলে গেছেন? তো এখন সম্পূর্ণভাবে লা—মাযহাবী ব্যাধি ও আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর হানাফী মাসলাকের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি।"

গ. নিছক সনদের বিচারে সহীহ হলেই আমল আবশ্যকীয় মনে না করা

আমরা প্রথমেই বলেছি যে, যে কোনো হাদীসের দু'দিক থাকে।

এক. ছুবূত বা প্রামাণ্যতার দিক

দুই. দালালাহ বা নির্দেশনার দিক

উভয় দিক স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দিকের নিজস্ব নিয়মনীতি রয়েছে, যার আলোকে সমাধান দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং হাদীস সহীহ হওয়ার অর্থ হলো, প্রথম দিক পূর্ণ হওয়া। দ্বিতীয় দিক পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত সঠিকভাবে আমল করা সম্ভব নয়। তাইতো সালাফের অনেক ইমাম হাদীসের সনদ সহীহ হওয়ার পরও নির্দেশনায় আপত্তি থাকায় আমল করেননি। ইমাম মালেক রাহ. (১৭৯হি.) বলেন, যখন আহলে ইলমের কারো নিকট আমলের বিপরীত হাদীস বর্ণনা করা হতো, তখন তাঁরা বলতেন,বলেছেন:

ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على خلافه®.

"এ সমুহ হাদীস আমাদের জানা আছে। কিন্তু উম্মাহর আমল তো এগুলোর উপর নেই।"

ইমাম মালেক রাহ. অন্যতম শাগরিদ আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রাহ. (১৯৭হি.) নিজ অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন:

لولا مالك بن أنس، والليث بن سعد لهلكت، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به®.

"মালেক ইবনে আনাস ও লাইছ ইবনে সাদ রাহ. না থাকলে আমি ধ্বংসের মুখে পতিত হতাম। আমার ধারণা ছিলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সমুহ হাদীসের উপর আমল করতে হয়!"

ইমাম বুখারী রাহ. (২৫৬হি.) এর বিশিষ্ট উস্তায আবু নুআইম ফাযলুবনু দুকাইন রাহ. (২১৯হি.) বলেন:

كنت أمر على زفر—ابن الهذيل من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة—وهو محتب بثوب فيقول: يا أحول تعال حتى أغربل لك أحاديثك، فأريه ما قد سمعت، فيقول: هذا يؤخذ به، وهذا لايؤخذ به، هذا ناسخ، وهذا منسوخ®

"আমি ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর বিশিষ্ট শাগরিদ যুফার ইবনে হুযাইল রাহ. এর পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি একটি কাপড় জড়িয়ে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, হে আহওয়াল! এ দিকে এসো। আমি তোমার হাদীসগুলোকে নিরীক্ষণ করে যাছাই করে দেই। এরপর বললেন, এই হাদীস মোতাবেক আমল করা যাবে আর ঐ হাদীস মোতাবেক আমল করা যাবে না। আর এটি রহিতকারী এবং ঐটি রহিত।"

ক্স কোনো হাদীস মোতাবেক যদি ফুকাহায়ে কেরাম আমল না করেন তাহলে এ কথা বোঝায় যে, এর খেলাফ মজবুত দলীল আছে।

হাফিয ইবনে হাজার রাহ. (৮৫২হি.) বলেন:

ويؤيده إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به، فدل على له معارضا راجحا.

"এর উপর ফুকাহা কেরামের সর্বসম্মতিতে আমল না করা বিষয়টিকে আরো জোরালো করে। এবং এ প্রমাণ বহন করে যে, এর বিপরীতে শক্তিশালী দলিল আছে।"

ইমাম ইবনে রজব হাম্বালী রাহ. (৭৯৫হি.) বলেন:

فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة: ومن بعدهم: أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به®

"মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহ মুহাদ্দিসগণ সহীহ হাদীসের উপর সাহাবা কেরাম বা পরবর্তীদের কোনো এক জামাতের আমল থাকলে তখন ঐ হাদীসের উপর আমল করে থাকেন। আর যে হাদীসের উপর সর্বসম্মতভাবে আমল হয়নি সে হাদীস মোতাবেক আমলের অনুমতি নেই। কারণ, তারা জেনে—বুঝেই হাদীস মোতাবেক আমলকে বাদ দিয়েছেন।"

ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রাহ. (১৬১হি.) বলেন:

قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها®

"অনেক হাদীস এমন রয়েছে যার উপর উম্মাহর আমল নেই।"

এই জন্য মুহাদ্দিসীনগণ বলেছেন, হাদীস সহীহ হলেই আমলযোগ্য হওয়া আবশ্যক নয়। অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে, যার উপর আমল হয় না। যেমন, মানসূখ হাদীস। এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এখানে প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

ইমাম তিরমিযী রাহ. (২৭৯হি.) তাঁর 'সুনান' কিতাব লেখার পর বলেন:

جميع ما في هذا الكتاب معمول به، وقد أخذ به بعض العلماء، ما خلا حديثين: حديث ابن عباس — رضي الله عنهما — أن النبي ، جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في المدينة، من غير خوف ولا سفر®.

وحديث النبي : إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه®.

"এ কিতাবে উল্লিখিত সমুহ হাদীসের উপর কোনো না উলামাগণের আমল রয়েছে। তবে দু'টি হাদীস ব্যতীত। একটি হলো, দুই নামায একত্রে আদায় প্রসঙ্গে, অন্যটি হলো, মদ পানের হদ সম্পর্কে।"

ইমাম তিরমিযী রাহ. এর বক্তব্যমতে এই দুই হাদীস মোতাবেক আমল হয় না। অথচ উভয়টিই সহীহ!

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বালী রাহ. (৭৯৫হি.) আরো অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন ইমামগণ আমল না হওয়ার দাবী করেছেন। যেমন তিনি বলেন:

وقد وردت أحاديث أخر، ذكر بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا®.

"এছাড়া আরো কিছু হাদীস রয়েছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে উলামা কেরাম বলেছেন, এগুলোর উপরও কারো আমল নেই।"

হাল যামানার সালাফী ও লা—মাযহাবী ভাইদের সবচেয়ে ভুল যা মহামারীর আকার ধারণ করেছে তা হলো, হাদীস সহীহ হলেই আমলযোগ্য মনে করা।

পক্ষান্তরে সালাফের কর্মপন্থানুসারে হাদীস সহীহ হলেই আমলযোগ্য হয়ে যায় না। বরং খতিয়ে দেখতে হয়, এর উপর সালাফগণের আমল রয়েছে কি না? অন্যান্য শর্ত আছে কি না?

ঘ. মতভেদপূর্ণ নির্দেশনায় একটিকে সুন্নাহ অপরটিকে মুনকার মনে না করা

শরীআতে কিছু বিষয় আছে, যা মতভেদপূর্ণ। যেখানে মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ করেছেন। আরো পরিস্কার করে বললে মতভেদ করতে বাধ্য হয়েছেন।

বড় বড় উলামা কেরামের সমান্বয়ে সংগঠিত সাউদী বোর্ড হলো, 'রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী'। যেখানে শায়খ ইবনে বায সহ আরো অনেক সালাফী আলেম রয়েছেন। তাদের এক সিদ্ধান্তে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তাদের সিদ্ধান্তের দু'একটি লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন, যে মুজতাহিদগণ ইচ্ছাকৃতভাবে মতভেদ করেন নি। বরং করতে বাধ্য হয়েছেন।

فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب، وهو الاختلاف الفقهي، ليس نقيصة، ولا تناقضا في ديننا، ولايمكن أن لايكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه وإجهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي.

فالواقع أن هذا الاختلاف، لايمكن أن لايكون®.

"দ্বিতীয় প্রকার ইখতিলাফটি মাযহাব সংক্রান্ত। এটি হলো ফিকহী বিষয়ে মতভিন্নতা। যা দীনের সাথে সাংঘর্ষিকপূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ এ জাতীয় কিছু নয়। আর এ মতভিন্নতা হওয়াই অবশ্যম্ভাবী। পরিপূর্ণ শরঈ বিধান সমৃদ্ধ যেখানে ইজতিহাদের সুযোগ আছে এমন কোনো জাতি এ মতভিন্নতা থেকে মুক্ত নয়। তাই বাস্তবতা হলো, এই মতভিন্নতা হওয়াই অনিবার্য।
"

শরীআতের অন্যান্য বিষয়ের মত হাদীসের নির্দেশনা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও মতভেদ হয়েছে। পিছনে আমরা কিছু পড়ে এসেছি। এর পক্ষে শতাধিক প্রমাণাদি পেশ করা যাবে। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় সংক্ষেপনের প্রতি মনোযোগী হ্িচ্ছ। এখানে আমাদের করণীয় হলো, স্বীকৃত ইজতিহাদকে মুনকার বা বাতিল না বলা। তবে আমল করতে নিজ এলাকায় স্বীকৃত ইজতিহাদ অনুযায়ী করতে হবে। বর্তমান সালাফীদের মত এমনিই। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

সালাফের প্রসিদ্ধ ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রাহ. এর কথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে। তিনি বলেন,

إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه ®

"মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে কাউকে কোনো একটির আমল করতে দেখলে তা থেকে বারণ করবে না। যদিও বা তুমি অন্যভাবে আমল করে থাকো।"

তবে কারো ভিন্ন আমলে কারণে যদি ফিৎনা বা আপত্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমামগণ নিয়ম মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঙ. দলিলের কারণে কোনো হাদীস ব্যাখ্যা করা হলে হাদীস অস্বীকারের অপবাদ না দেয়া

আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি যে, সাহাবা কেরাম রা. সহ সালাফের অন্যান্য ইমামগণ প্রয়োজনে হাদীস ব্যাখ্যা করেছেন। বরং কোনো ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাদের ব্যাখ্যার সমর্থন করেছেন। সুতরাং প্রয়োজনে হাদীসকে ব্যাখ্যা করা একটি স্বীকৃত বিষয়। এর বিপরীত আর একটি বিষয় হলো, হাদীস জেনে কারণ ছাড়াই রাদ্দ বা প্রত্যাখ্যান করা। উভয়টি ভিন্ন। তাই হাদীস ব্যাখ্যা করাকে হাদীস প্রত্যাখ্যান করা কখনোই বলা যায় না। এমন বললে সাহাবা কেরামও এ অপবাদে শামিল হবেন যা কখনো সম্ভব নয়।

এ ছাড়া সালাফীরাও ব্যাখ্যা করে থাকেন। ইমাম বুখারী রাহ. ব্যাখ্যা করেছেন একাধিক হাদীস। অনেক উদহারণ পেশ করা যাবে। আলোচনা দীর্ঘ হতে যাচ্ছে তাই শুধু একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি।

সুতরাং আমরা বুঝে নিলাম হাদীস ব্যাখ্যা করা আর প্রত্যাখ্যান করা এক নয়। সালাফীদের শ্রদ্ধেয় ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহ. এ বিষয়ে সুন্দর আদর্শ রেখে গেছেন। যদি বর্তমান সালাফীরা তা গ্রহণ করতো অধিকাংশ বিশৃঙ্খলা থেকে বিরত থাকতো। ইমাম মালেক রাহ. (১৭৯হি.) 'খিয়ারে মাজলিস' সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীসটি থেকে একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। যা অন্যদের মনো:পুত না হওয়ায় তারা এর উপর জোর আপত্তি উত্থাপন করে, এবং বলে, ইমাম মালেক এ

হাদীস মানে না; প্রত্যাখ্যান করে। এ আপত্তি শুনে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহ. (২৪১হি.) তাদের প্রতিউত্তরে বলেন:

®...مالك لم يرد الحديث ، ولكن تأوله على غير ذلك

"হাদীসটি ইমাম মালেক রাহ. প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র।"

আমাদের ইমামগণ যখন কোনো হাদীস অন্য দলীলের কারণে ব্যাখ্যা করেন তখন লা—মাযহাবী সহ কিছু মহল থেকে অপবাদ দেওয়া হয় যে, এরা হাদীস মানে না; প্রত্যাখ্যান করে। মূলত এ সকল অপবাদ দাতারা সালাফী নয়। কারণ, সালাফ এমন দাবীর সমর্থন করে না।

চ. বিচ্ছিন্ন পথ ও মত থেকে দুরে থাকা

আল্লাহ তাআলা কুরআনে 'জামাআহ'র সাথে থাকার প্রতি জোর তাকিদ দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'শুযুয' ও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন না করার প্রতি কঠিন ভাষায় সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন:

®من شذ شذ في النار

"(আহলুস সুন্নাহ থেকে) যে বিচ্ছিন্ন হবে, সে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে যাবে।"

সালাফের ইমামগণও বিচ্ছিন্নতাকে সমর্থন করতেন না। বরং তা থেকে দুরে থাকার চেষ্টা করতেন। হাদীসের প্রামাণিকতা ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে 'গারাবাত' ও 'শুযূয' থেকে সর্বদা দুরে থাকার চেষ্টা করতেন। ইমাম ইবনে রজব হাম্বালী রাহ. (৭৯৫হি.) ও ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৪৬৩হি.) সহ আরো অনেকেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সালাফের দু' একটি বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি।

ইমাম শুবা রাহ. বলেন:

®لا يجيئ الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ.

"বিচ্ছিন্ন হাদীস যা অন্য কেউ বর্ণনা করে না তা একমাত্র বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি থেকেই আসে।"

ইমাম মুআবুয়া ইবনে কুর্‌রা রাহ. বলেন:

®إياك والشاذ من العلم

"ইলমের মাঝে বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান!"

ইমাম আলী ইবনে হুসাইন রাহ. বলেন:

®ليس من العلم ما لا يعرف ، إنما العلم ما عرف وتوطأت عليه الألسن

"অজানা অপরিচিত বিষয় ইলমের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ, ইলম তাই যা মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়।"

এ বক্তব্যগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে, সালাফ ইমামগণ বিচ্ছিন্ন পথ ও মত পরিহার করতেন। সুতরাং আমাদেরকেও সর্বক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা থেকে বেচে থাকতে হবে।

বক্ষ্যমাণ কিতাব অধ্যয়ন করলেই প্রতীয়মান হবে যে, বর্তমান আহলে হাদীস ও সালাফী ভাইয়েরা বিচ্ছিন্নতার শিকার। 'শুযূযের' সর্বনিম্ন স্তর হলো, 'যাল্লাহ' বা পদস্খলন। অর্থাৎ কোনো আলেমের পদস্খলন ও ভুল। সালাফের ইমামগণ কারো 'যাল্লাহর' অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমান লা—মাযহাবীরা ও সালাফীরা এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে না। বক্ষ্যমাণ কিতাবে বহু উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ধরুন, কোনো দূর্বল বর্ণনায় ' على صدره' শব্দটি এসেছে, যা উসূলে হাদীসের বিচারে 'শায'। তারা এই শায শব্দ নিয়ে মেতে উঠলো, আর প্রচার শুরু করে দিলো, নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধতে হবে; এটাই সুন্নাহ! অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে সালাফের পূর্ণ যুগে এর উপর কোনো আমল হয়নি।

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখুন, নামায আমরা আজ নতুন পড়ছি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে নামায পড়েছেন। যুগে যুগে মুসলমানগণ নামায পড়েছেন। কিন্তু কেউ বুকের উপর হাত বাঁধতেন না। আজ একটি শায ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ শব্দ নিয়ে নামাযের নতুন পদ্ধতি আবিস্কার করে তারা দাবী করে যে, এটাই সুন্নাহ। অথচ এটা সুন্নাহ নয়।

ছ. দাবী ও দলিলের মাঝে তারতম্যের প্রতি সতর্ক থাকা

লা—মাযহাবী ও সালাফীরা সাধারণ মানুষকে সাধারণত প্রভাবিত করে বিভিন্ন দলিলে হাদীস বলে। সাধারণ মানুষতো বোঝে না যে তার দাবী ও প্রমাণের সাথে মিল আছে কি না। অনেক সময় দাবী ও দলিলের সাথে পূর্ণ মিল থাকে না সেখানে তারা হাদীসের সাথে নিজের বুঝ শামিল করে দেয়। অর্থাৎ তখন দলিল হয় হাদীস ও তার নিজের বুঝ। কিন্তু বলার আন্দায থেকে মনে হয়, পুরোটাই হাদীস! সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যদি আমরা দলিল বুঝার যোগ্যতা না রাখি, তাহলে তাদের কথা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কোনো বিজ্ঞ আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে নিবো। তার সাথে বিষয়টি আলোচনা জিজ্ঞাসা করে নিবো। এটা মনে রাখতে হবে, সালাফীদের অধিকাংশ দলিলে নিজেদের বুঝের সংমিশ্রন রয়েছে।

জ. আমলের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া

পিছনের আলোচনা থেকে আশা করি পরিস্কার হয়েছে যে, সালাফের ইমামগণ হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে শুধু সনদ দেখাকে যথেষ্ট মনে করতেন না । বরং হাদীসটি অগ্রগণ্য কি না তা বিবেচনা করতেন। 'আছহ' এর তুলনায় 'আরজাহ' এর প্রতি তাদের গুরুত্ব তুলনামুলক অধিক ছিলো। স্বয়ং ইমাম বুখারী রাহ. (২৫৬হি.) এর আমল থেকেই এ নীতি প্রমাণিত হয়। মুহতারাম উস্তায বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও হাদীস বিশ্লেষক মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব হাফিযাহুল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন:

"ইমাম বুখারী রাহ. (২৫৬হি.) নিজে 'কিতাবুস সালাত' —এর দ্বাদশ অধ্যায়ে 'باب ما يذكر في الفخذ' উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত কি না— এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم®

অর্থাৎ আনাস রা.—এর হাদীস (যার দ্বারা উরু সতর না—হওয়া প্রমাণ হয়) সনদের বিচারে অধিক সহীহ হলেও জারহাদের হাদীস (যাতে উরু সতর হওয়ার কথা আছে) সতর্কতার বিচারে অগ্রগণ্য। যাতে ইখতিলাফের মধ্যে থাকতে না হয়। ফাতহুল বারী'তে (১/৫৭১) আছে ইমাম বুখারী রাহ. 'আততারীখুল কাবীর'— এ সহীহর বিপরীতে যয়ীফের উপর আমল করাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। কারণ এটাই সতর্কতার দাবী। যে মাযহাবে উরু সতর সেই মাযহাব অনুসারেও যেন গোনাহগার হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

ঝ. হানাফী মাযহাবের ব্যাখ্যা অনুপাতে কুরআন—সুন্নাহ অনুসরণ করা

পিছনের আলোচনা থেকে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি যে, কুরআন—সুন্নাহর যে বিষয়গুলি আমরা নিজেরা বুঝি না। সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞানীদের শরণাপন্ন হতে হবে। নিজ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অনুমতি নেই। এখন কথা হলো, কার নিকট শরণাপন্ন হবো, কার কথা গ্রহণ করবো? বর্তমান সালাফী আলেমগণই ফাতাওয়া দিয়েছেন যে, নিজ নিজ শহরের উলামা কেরাম এর ফাতাওয়া অনুযায়ী কুরআন—সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে। আমাদের দেশে হানাফী মাযহাবই প্রতিষ্ঠিত। যা কুরআন—সুন্নাহরই যথার্থ ব্যাখ্যা। তাই আমরা হানাফী আলেমদের শরণাপন্ন হব। আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বীকৃত মাযহাব মানেই কুরআন—সুন্নাহর যথার্থ ব্যাখ্যা। মাযহাব অনুসরণের অর্থ ব্যক্তির অনুসরণ নয়, বরং কুরআন—সুন্নাহর ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা এবং ব্যাখ্যা নিয়ে মূল কুরআন—সুন্নাহরই অনুসরণ করা। এ বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি না করতে পেরেই আহলে হাদীস ভাইয়েরা অনর্থক হাঙ্গামা সৃষ্টি করে থাকে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।

বর্তমান সালাফী আলেমরা নিজ দেশের সুন্নাহসম্মত আমল বাদ দিতে বলেন না। বরং নিজ দেশের আলেমদের তাকলীদ করতে বলেছেন। যেমন, শায়খ আবদুর রাহমান সাদী বলেন:

العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء من خارج بلدهم؛ لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والنزاع.

"সাধারণের জন্য অন্য শহরের উলামাগণের অনুসরণ সম্ভব নয়। কারণ, এতে বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা তৈরী হওয়ার সমুহ সম্ভাবনা বিদ্যমান।"

শায়খ উসাইমীন বলেন:

لأن فرضك أنت هو التقليد، وأحق من تقلد علماؤك، ولو قلدت من كان خارج بلادك أدى ذلك إلى ... الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرعي... فالعامي يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق بهم.

“আপনার উপর তাকলীদ আবশ্যক। আর এ ক্ষেত্রে আপনার শহরবাসী উলামা কেরামই অধিক যথার্থ। অন্যথায় এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে যার অনুমতি শরীআত প্রদান করেনি। তাই সাধারণের জন্য তার নিজ শহরের নির্ভরযোগ্য আলেমগণের অনুসরণ করা আবশ্যক।”

সাউদীর সালাফীরাও হাম্বালী মাযহাবের অনুসরণ করে থাকে। যেমন, সাউদী সালাফীদের অন্যতম আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব নাজদী মারহুম ও তার মত সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে:

ونحن أيضاً : في الفروع، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير ؛ الرافضة، والزيدية، والإمامية، ونحوهم ؛ ولا نقرهم ظاهراً على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة®

“আমরাও ফিকহী শাখাগত মাসাইলে হাম্বালী মাযহাবের অনুসরণ করে থাকি। চার ইমামের অনুসারীদের কারো আমরা বিরোধিতা করি না। অন্য মাযহাবের যেহেতু সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি। যেমন, রাফেযা, যাইদিয়্যাহ, ইমামিয়্যাহ, ইত্যাকার সমুহ মাযহাব। বাতিল মাযহাবের কোনোটিকে আমরা স্বীকৃতি দান করি না। বরং তাদেরকে চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসরণের বাধ্যতা আবশ্যক করি।”

মূলত এ সিদ্ধান্ত কুরআন—সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত। সালাফের যামানাতেও এর প্রচলন ছিলো। আহলে হাদীস লা—মাযহাবী ও সালাফীরা প্রথমে এ সিদ্ধান্ত না দিলেও পরবর্তীতে পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে এ সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হয়েছে। সাহাবা কেরামের রা. যামানাতেও নির্দিষ্ট মাযহাব অবলম্বন করা হতো। এখানে দু’টি নস উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

ইমাম আলী ইবনে মাদীনী রাহ. বলেন:

لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس®

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণের মাঝে তিনজন ব্যক্তির মাযহাব ও ফতোয়া অনুসরণ করা হতো। তাঁরা হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., যায়েদ ইবনে ছাবিত, আবদুল্লা ইবনে মাসউদ রা.।”

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. (৭২৮হি.) শিয়া মতবাদের দাবী ‘মাযহাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবাদের যামানায় ছিলো না’ এর প্রতিউত্তরে বলেন:

قوله: إن هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة®

إن أراد : أن الأقوال التي لهم لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ، بل تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ، وابتدعوا خلاف ذلك ، فهذا كذب عليهم ، فإنهم لم يتفقوا على مخالفة الصحابة ، بل هم وسائر أهل السنة متبعون للصحابة في أقوالهم ، وإن قدر أن بعض أهل السنة خالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم ، فالباقون يوافقونهم ويثبتون خطأ من يخالفهم ، وإن أراد أن نفس أصحابها لم يكونوا في ذلك الزمان ، فهذا لا محذور فيه ،

فمن المعلوم أن كل قرن يأتي يكون بعد القرن الأول...

وأهملوا أقاويل الصحابة® كذب منه ، بل كتب أرباب المذاهب مشحونة بنقل أقاويل الصحابة : قوله والاستدلال بها ، وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى ، وإن قال أردت بذلك : أنهم لا يقولون : مذهب أبي بكر وعمر ونحو ذلك ، فسبب ذلك ، أن الواحد من هؤلاء جمع الآثار وما استنبطه منها ، فأضيف ذلك إليه كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها ، كالبخاري ومسلم وأبي داود وكما تضاف القراءات إلى من اختارها كنافع وابن كثير ،

وغالب ما يقوله هؤلاء منقول عمن قبلهم وفي قول بعضهم ما ليس منقولا عمن قبله لكنه استنبطه من تلك الاصول®

“তার (মিনহাজুল কারামার মুসান্নিফ আবু মানসূর হিল্লী শীয়ীর) দাবী, ‘মাযহাব চতুষ্টয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরাম রা. এর যামানায় ছিলো না’ এ থেকে যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় যে, মাযহাবের ইমামগণের মতামত সমুহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবা রা. থেকে অনুসৃত নয়, বরং নবআবিস্কৃত। তাহলে তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা—বানোয়াট। কারণ, তাঁরা সাহাবা কেরাম রা. এর বিরোধিতা করার উপর সর্বসম্মত হননি। বরং সকলেই সাহাবা কেরাম রা. এর অনুসরণ করতেন। আর কেউ কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলেও অন্যরা তার সাথে সহমত পোষণ করেননি।

আর যদি তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, মাযহাবের ইমামগণ ঐ যামানায় ছিলেন না; পরবর্তী যামানায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাহলে এতে দোষের কিছু নেই। কারণ, সর্বজনবিদিত কথা যে, প্রত্যেক পরবর্তীগণ পূর্ববর্তী যামানায় বিদ্যমান থাকেন না।

তার বক্তব্য ‘মাযহাবের ইমামগণ সাহাবা কেরাম রা. এর ফাতাওয়াসমুহ অনুসরণ করে না; বরং তাদের বিরোধিতা করে।’ এ দাবিও অবাস্তব ও অসার। কারণ, মাযহাবের সমুহ কিতাবাদি সাহাবা কেরাম রা. এর ফাতাওয়া দিয়ে টইটম্বুর। যা দ্বারা তারা প্রমাণ পেশ করেছেন। যদিও বা এক মাযহাবে এক ফতোয়া অন্য মাযহাবে অন্য ফতোয়া। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে, আবু বকর রা. বা ওমর রা. এর প্রতি মাযহাবের নিসবাত হয় না কেন? (যেমনটি হানাফী মালেকী শাফেঈ হাম্বালী বলা হয়)। এর কারণ হলো, এ সমস্ত ইমামগণের প্রত্যেকে সমস্ত ‘আছার’ ও তা থেকে উদ্ভাবিত বিধান একত্রিত করেছেন। এবং (উসূল ভিত্তিক প্রয়োজনে) ইজতিহাদ করে এতে সমৃদ্ধি করেছেন। তাই তাদের প্রতি মাযহাবের নিসবাত হয়ে থাকে। যেমন, হাদীসের কিতাব সমুহে সংকলকের প্রতি নিসবাত করে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ইত্যাদি বলা হয়। যেমনটি কিরাতের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের গৃহীত কিরাতকে তার প্রতি সম্বন্ধ করা হয়ে থাকে। আর ইমামগণের অধিকাংশ মতামত তাদের পূর্ববর্তীদের থেকেই গৃহিত বা উসূলের আলোকে উদ্ভাবিত।”

যেহেতু দলিল ও বাস্তবতার দাবী হলো, নিজ এলাকার স্বীকৃত আমল জারী রাখা। হাজার শতাব্দী পূর্বে খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাহ. এ ফরমান জারী করেছেন যে,

ليقض كل قوم بما اجتمع عليه فقهائهم.

“প্রত্যেক গোত্র যেন স্থানীয় ফকীহগণের অনুসরণ করে।”

অন্যরা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি। তাইতো ইমাম মালেক রাহ. বর্তমান লা—মাযহাবী সুলভ কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেননি। বরং নির্দিষ্ট মাযহাব অবলম্বন করতে বলেছেন। যেমন, তিনি বলেন:

فدع الناس وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم.

“প্রত্যেক শহরবাসীর আমলকে তাদের নিজেদের উপর ন্যাস্ত করে দিন।”

বলা বাহুল্য যে, ‘হাদীস ও সুন্নাহ’র ক্ষেত্রে ভিন্নমতের আশ্রয় নিয়ে বিশৃঙ্খলা করা নিতান্তই গর্হিত কাজ হবে। এবং নতুন নতুন ফিতনার কারণ হবে। সালাফের ইমামগণ কখনোই তা সমর্থন করেননি।

খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী রা. সুন্দরই বলেছেন:

أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟!

“আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলা হোক তা পছন্দ করো?!”

সাধারণ মানুষকে তাকলীদ করতে হবে এটি একটি ইজমাঈ বা সর্ববাদীসম্মত মত। এ বিষয়ে আলহামদুলিল্লাহ উলামা কেরাম প্রচুর লেখা—লেখি করেছেন। এখানে নতুন করে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু এখানে হাদীসের ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৪৬৩হি.) ও আরেকজন হাদীসের ইমাম খতীব বাগদাদী রাহ. (৪৬৩হি.) এর বক্তব্য তুলে ধরাই যথেষ্ট। ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৪৬৩হি.) বলেন:

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عز وجل {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣] وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه®

"উলামা কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য স্থানীয় উলামা কেরামের অনুসরণ অপরিহার্য। আর কুরআনে 'যদি এ বিষয়ে তোমাদের জানা না থাকে তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও' আয়াতটিও তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উলামা কেরামের ঐক্যমতে অন্ধ ব্যক্তির নিকট কিবলা নির্ধারণ করা মুশকিল হলে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কারো অনুসরণ করবে। ঠিক তেমনি যার দীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই সে ব্যক্তিও স্থানীয় আলেমের অনুসরণ করবে।"

খতীব বাগদাদী রাহ. (৪৬৩হি.) কার জন্য তাকলীদ করা আবশ্যক এ সংক্রান্ত একটি অধ্যায় স্থাপন করে বলেন:

أما من يسوغ له التقليد فهو العامي: الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية , فيجوز له أن يقلد عالما , ويعمل بقوله , قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: ٤٣] ®

"সাধারণ ব্যক্তি যে শরঈ বিধি—বিধান সম্পর্কে জানার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। তার জন্য আলেমের অনুসরণ করা উচিত। এবং আল্লাহ তাআলার এ বাণী 'যদি এ বিষয়ে তোমাদের জানা না থাকে তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও' এর উপর আমল করবে।"

ঞ. জাফরী চিন্তা পরিহার করা

আব্বাসী খলীফা আবু জা'ফর চিন্তা করেছিলেন যে, সারা বিশ্বে এক পদ্ধতিতে আমল হবে, বিভিন্নতা থাকবে না। সব মাযহাব একীভূত করা হবে। এ মনোবাসনা তিনি ইমাম মালেক রাহ. (১৭৯হি.) এর নিকট এভাবে প্রস্তাব করলেন:

قد أردت أن أجعل هذا العلم علما واحدا ، فاكتب به إلى أمراء الأجناد وإلى القضاة فيعملون به ، فمن خالف ضربت عنقه®.

"আমি সকলকে একই পদ্ধতিতে আমল করার উপর একত্রিত করতে চাচ্ছি। তাই আপনি সকল সেনা বাহিনী ও কাযীদের নিকট এ মর্মে পত্র পাঠান। যে এর বিরোধিতা করবে তার গর্দান আমি উড়িয়ে দিব।"

বর্তমান সালাফী ভাইদের চিন্তা অনেকাংশেই খলীফা আবু জা'ফর এর সাথে মিলে যায়। কিন্তু ইমাম ইমাম মালেক রাহ. (১৭৯হি.) তার এ চিন্তার সাথে সহমত পোষণ না করে তাকে এর বাস্তবতা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, এটি একটি বাস্তবতা বিবর্জিত চিন্তা। যেমন তিনি বলেন:

يا أمير المؤمنين أو غير ذلك قلت :إن النبي ، كان في هذه الأمة وكان يبعث السرايا وكان يخرج فلم يفتح من البلاد كثيراً حتى قبضه الله عز وجل ، ثم قام أبو بكر رضي الله عنه بعده فلم يفتح من البلاد كثيراً ، ثم قام عمر — رضي الله عنه — بعدهما ففتحت البلاد على يديه ، فلم يجد بدًّا من أن يبعث أصحاب محمد ، معلمين فلم يزل يؤخذ عنهم كابراً عن كابر إلى يومهم هذا، فإن ذهبت تحولهم مما يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفراً . ولكن أقرَّ أهل كل بلدة على ما فيها من العلمِ®.

"আমীরুল মুমিনীন! এছাড়া অন্য কোনো ফরমান ছিলো? আমি (মালেক রাহ.) বললাম, দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উম্মাহর মাঝে ছিলেন, তিনি বিভিন্ন স্থানে সেনা বাহিনী পাঠিয়েছেন। এবং নিজেও শরীক হতেন। বেশী শহর বিজয় করার পূর্বেই তিনি পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। এরপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত আবু বকর রা. এর কাঁধে। তিনিও তেমন বেশী শহর জয় করার পূবেই মালিকের সান্নিধ্যে চলে যান। এরপর এ মহা দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে দাড়ালেন হযরত ওমর রা.। তার হাতে অনেক শহর বিজিত হলো। যার কারণে তিনি বিভিন্ন প্রদেশে সাহাবাগণকে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করলেন। বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ তাদের থেকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আজ পর্যন্ত এভাবেই দীনকে জেনে—বুঝে আসছে। তাই এখন যদি আপনি ভিন্ন কোনো অপরিচিত পদ্ধতির উপর তাদেরকে আহ্বান করেন, তারা প্রথমটিকে ইসলাম বহির্ভুত মনে করবে! বিধায় প্রত্যেককে নিজ নিজ ইলম ও আমলের উপর বহাল রাখুন।"

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৪৬৩হি.) এ ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন:

ر ﴿وهذا غاية في الإنصاف ﴾

"এটা অত্যন্ত ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠ কথা।"

খলীফা আবু জা'ফর ইমাম মালেক রাহ. (১৭৯হি.) এর কথা মেনেও নিয়েছেন। এবং নিজ চিন্তার ভুল বুঝে তা বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থেকেছেন। মূলত ইমাম মালেক রাহ. এ আদর্শ পেয়েছেন খলীফায়ে রাশেদ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাহ. থেকে। প্রসিদ্ধ কথা যে, তিনি সুন্নাহ যিন্দা করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট ছিলেন। তিনিও এক সময় এমন চিন্তা পোষণ করে ছিলেন। কিন্তু পরে দলিল ও বাস্তবতার আলোকে বিষয়টির পরিণাম উপলদ্ধি করতে পেরে তা পরিহার করেন। সুলাইমান ইবনে হাবীব রাহ. বলেন:

أراد عمر بن عبد العزيز أن يجعل أحكام الناس والأجناد حكما واحدا، ثم قال: إنه قد كان في كل مصر من ر أمصار المسلمين، وجند من أجناده ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيهم قضاة، قضوا بأقضية أجازها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضوا بها، وأمضاها أهل المصر، كالصلح بينهم، فهم على ما كانوا عليه من ذلك﴾.

"ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাহ. চাইলেন, সকল মানুষকে একই আমলের উপর একতাবদ্ধ করতে। তারপর বললেন, মুসলিম প্রত্যেক শহরেই তো সাহাবা কেরাম ছিলেন। তাদের মাঝে কাযী ছিলো। তারা বিভিন্ন সমাধান দিতেন যার উপর অন্য সাহাবা কেরাম সম্মতি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। এবং শহরবাসীকে সন্ধির ন্যায় এর উপর বহাল রাখতেন। আর তারা তো এই আমলের উপরই বহাল আছে।"

এ আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সালাফের যামানায় সকল মাযহাব একীভূত করার চিন্তা বরাবর ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে যারা এ চিন্তা পোষণ করেন, তারা মূলত একটি ভুল চিন্তাই লালন করে আসছেন। যার বাস্তবতা আদৌ সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমাদেরকে এ চিন্তা পরিহার করতে হবে।

সুন্নাহের বিভিন্নতা ও আমাদের করণীয়

হাদীসের জটিলতম দিকগুলোর মাঝে অন্যতম হলো, সুন্নাহর বিভিন্নতা। শরীয়তের বিধানগুলো মধ্যে এমন কিছু বিধান রয়েছে, যার একাধিক পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুসৃত হয়েছে। সর্বস্বীকৃতভাবে উভয়টিই সুন্নাহ অথবা ইজতিহাদের ভিত্তিতে এক ইমাম 'একটাকে' সুন্নাহ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অন্য ইমাম নিজ ইজতিহাদের ভিত্তিতে 'অন্যটিকে' সুন্নাহ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

সালাফীদের ইমামগণও সুন্নাহ এর এরূপ 'বিভিন্নতাকে' মানেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন,

واختلاف التنوع على وجوه: منه: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة، حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ر﴿كلاكما محسن﴾.

ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، والاستفتاح، والتشهدات، وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد، وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل.

"সুন্নাহর বিভিন্নতা কয়েক প্রকার:

একটি হলো, যেখানে উভয়টি হক ও শরীআত সম্মত। যেমন, কিরাতের ক্ষেত্রে সাহাবা কেরাম রা. বিভিন্নতা। এমনকি তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাসনের স্বরে বললেন, তোমরা উভয়েই সঠিক! আযাে— ইকামাতের পদ্ধতি, ইস্তিফতাহ, তাশাহহুদ, সালাতুল খাওফ, দুই ঈদের তাকবীর, জানাযার তাকবীর ইত্যাকার বিষয়ের বিভিন্নতাও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যার সবগুলোই শরীআত সম্মত। যদিও একটি অন্যটি থেকে উত্তম হতে পারে।"

সুন্নাহর মাঝে বিভিন্নতা একটি স্বীকৃত বিষয়। যা দলিল—প্রমাণে ভরপুর। তবে কলেবর দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় শুধু আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. (৭২৮হি.) এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করা হলো। এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী তা তারই বক্তব্য থেকে তুলে ধরছি। তিনি বলেন,

وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد: أن جميع صفات العبادات؛ من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا لم يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله، كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة وسجود السهو والقنوت قبل الركوع وبعده والتحميد بإثبات الواو وحذفها وغير ذلك®.

"এ ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাধিক সঠিক নীতি হলো, ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইবাদাতের বিষয়ে একাধিক পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য বর্ণনায় পাওয়া গেলে কোনোটাকেই মাকরূহ বলা যাবে না। বরং সবগুলোই শরীআত সম্মত। যেমন, সালাতুল খাওফ, আযানের মাঝে তারজী' বা তারজী' ছাড়া, ইকামাত জোড়া বা একবার করে দেওয়া। যেমনটি আমরা তাশাহহুদের বিভিন্ন পদ্ধতি, নামাযের শুরুতে সূরা বিভিন্ন দুআ, বিভিন্ন কিরাত, দুই ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর, জানাযার নামায, সিজদা সাহু, রুকূর আগে এবং পরে কুনূত পড়ার বিভিন্ন পদ্ধতি, সামিআল্লাহ হামযা সহ বা ছাড়া এ সমুহ পদ্ধতি শরীআত সম্মত।"

তাঁরই বিশিষ্ট শাগরিদ আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. (৭৫১হি.) ও এমন মত পোষণ করেন।

মুহতারাম উস্তায মুহাদ্দিস ও নাকিদুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব হাফিযাহুল্লাহ এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য উম্মাহর ঐক্য: পথ ও পন্থা দেখা যেতে পারে। এখানে কিছু খণ্ডিত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

১. যেহেতু সুন্নাহ মোতাবেক আমল হওয়াই উদ্দেশ্য তাই যে এলাকায় যে সুন্নাহর উপর আমল হচ্ছে এবং যে মসজিদে যে সুন্নাহর অনূসরণ হচ্ছে সেখানে তা—ই বহালা থাকতে দেয়া উচিত। ওই এলাকায় ওই মসজিদে সাধারণ মানুষকে দ্বিতীয় সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া মোটেই উচিত নয়। এ দাওয়াত খাইরুল কুরুন তথা সাহাবা—তাবেঈনের যুগে ছিলোনা। যেসব ক্ষেত্রে সুন্নাহ একটি সেখানে সেই সুন্নাহর অবহেলা করা হলে সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দিতে হবে। তেমনি কেউ সুন্নাহ ছেড়ে বিদআতে লিপ্ত হলে তাকে বাধা দিতে হবে এবং সুন্নাহর দিকে আসার দাওয়াত দিতে হবে। এ দাওয়াত সালাফের যুগে ছিলো।

একাধিক সুন্নাহর ক্ষেত্রগুলোতে বেশীরচে' বেশী এই তো হবে যে, আপনার বা আপনার উস্তাযের গবেষণা কিংবা আপনার প্রিয় মুহাদ্দিস বা প্রিয় ইমামের গবেষণা অনুযায়ী যে সুন্নাহ মোতাবেক আপনি আমল করছেন তা অপর সুন্নাহ থেকে অগ্রগণ্য বা সুন্নাত হওয়ার দিকটি তাতে বেশী স্পষ্ট। তো এতটুকু অগ্রগণ্যতা সাধারণ মানুষকে সেদিকে আহ্বান করার জন্য যথেষ্ট নয়। নতুবা একই কথা অন্য পক্ষেরও বলার অবকাশ থাকবে। তো উভয় পক্ষ যখন নিজেদের দিকে আহ্বান করতে থাকবে তখন ফলাফল কী হবে? এতে কি সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে অস্থিরতা ছড়ানো হবেনা?

এ শ্রেণীর মতভেদকে তো ইসলাম ও কুফর কিংবা সুন্নাহ ও বিদআহর মতো বিভেদ—বিচ্ছিন্নতার মতভেদ সাব্যস্ত করা যায় না। এখানে অন্য পক্ষের মতামতের দালিলিক ভিত্তি স্বীকার করতে হবে (যদি ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠা থাকে) তাহলে একের দৃষ্টিতে যে প্রাধান্য ও অগ্রগণ্যতা তা অন্যের উপর কেন আরোপ করা হবে?

২. এ—ধরনের বিষয়ে সর্বোচ্চ যা হতে পারে তা এই যে, আলেমগণ নিজেদের মাঝে আলোচনা করতে পারেন এবং পারস্পরিক মতবিনিময় ও চিন্তার আদান—প্রদান হতে পারে। এ জাতীয় বিষয়ে সালাফের ফকীহ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের থেকে এটুকুই পাওয়া যায়।

৩. এই বিষয়গুলোকে 'নাহি আনিল মুনকার'—এর আওতায় নিয়ে আসা এবং কোনো একটি পন্থার উপর মুনকার ও অসৎকাজের মতো প্রতিবাদ করা, সেই পন্থার অনূসারীদের নিন্দা—সমালোচনা করা, তাদেরকে সুন্নাহ বিরোধী ও হাদীসবিরোধী আখ্যা দেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ।

নিজ এলাকার স্বীকৃত সুন্নাহ মত নামায আদায় করলেই তার নামায আদায় হয়ে যাবে। সালাফীদের আস্থাভাজন ইমাম ইবনে হাযম রাহ. (৪৫৬হি.) বলেন:

فلما صح أنه عليه السلام كان يرفع في كل خفض ورفع بعد تكبيرة الإحرام ولا يرفع، كان كل ذلك مباحا لا رَ فرضا، وكان لنا أن نصلي كذلك، فان رفعنا صلينا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وان لم نرفع فقد صلينا كما كان عليه السلام يصلي®

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাকবীরে তাহরীমার পর ‘রফয়ে ইয়াদাইন করা; না করা: উভয় পদ্ধতিই প্রমাণিত। সুতরাং তা ফরয নয়, বরং মুবাহ মাত্র। আমাদের উচিত এভাবেই নামায আদায় করা। তাই আমরা রফয়ে ইয়াদাইন করি বা না করি উভয়টিই নবীজীর নামায।”

সুন্নাহর বিভিন্নতার ক্ষেত্রে একটি বিচ্ছিন্ন চিন্তা

আমরা জানলাম যে, সুন্নাহর বিভিন্নতা একটি বাস্তবতা যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী তাও জেনেছি। সুন্নাহর বিভিন্নতার ক্ষেত্রে কেউ কেউ ভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকে। যা সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন চিন্তা। এ বিষয়টি আমাদের স্বরণ রাখতে হবে।

সুন্নাহর বিভিন্নতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানাতেও ছিলো। চার খলীফার যামানাতেও ছিলো। এখনও আছে। প্রত্যেক দেশে চলমান সুন্নাহ মোতাবেক সেখানে আমল হতো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা কখনো বলেননি যে, সকল দেশের আমল এক হতে হবে, প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী সে আমল করতে পারবে। সকাল বেলায় আবু মাহযূরা রা. এর মত আযান দিতে পারবে, আর বিকালে হযরত বিলাল রা. এর মত আযান দিতে পারবে! কিংবা সকালে এক রকম নামায পড়তে পারবে, আর বিকালে ভিন্ন আরেক পদ্ধতিতে নামায পড়তে পারবে। তারা এমন কোনো ব্যাপক ফরমানও জারী করেননি। এবং এটাকে আমল বিল মারূফ নাহি আনিল মুনকার এর আওতায় নিয়ে আসেননি। বরং প্রত্যেক দেশের আমলকে বাকী রেখেছেন, সমর্থন করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক দেশের দলিলসিদ্ধ আমল বাকী রাখা হলো সুন্নাহর বিভিন্নতার ক্ষেত্রে সঠিক চিন্তা। যা আমরা পিছনে পড়ে এসেছি।

সালাফীদের কারো কারো আলোচনা থেকে বুঝা যায়, তারা এ সঠিক চিন্তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

তারা সর্বাবস্থায় ব্যাপকভাবে বলতে চায় যে, উভয়টি যেহেতু হাদীসে আছে, তাই কারো ইচ্ছা হলে যে কোনো একটির উপর আমল করলেই হলো। এক লা—মাযহাবীর সাথে আলোচনা করার সময় সে তো বলেই ফেলেছে যে, পালাবদল করে আমল করবে; কখনো এটির উপর, কখনো অন্যটির উপর। শুধু একটির উপর আমল করে অন্যটিকে বাদ দেওয়া যাবে না।

তাদের এ চিন্তা সুন্নাহসম্মত নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, হাদীস যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই গ্রহণ করবো, তেমনি হাদীস গ্রহণ করার পদ্ধতিও তাঁর থেকেই গ্রহণ করতে হবে। এক বিষয়ে নানা পথ ও মত অবলম্বন করতে করতে এক পর্যায়ে সব পথ হারিয়ে বসে। কখনো কখনো তো দীনও হাতছাড়া হয়ে যায়। লা—মাযহাবীদের ইমাম হুসাইন বাটালাবী দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে এ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন:

جناب بٹالوی صاحب... لکھتے ہیں: بچیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق (ہونے کا دعوی کرتے ہیں) اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں، کفر وارتداد کے اسباب اور بھی بکثرت موجود ہیں، مگر دین داروں کے بے دین ہو جانے کے لیے بے علمی کے ساتھ ترک تقلید بڑا بھاری سبب ہے۔

“জনাব বাটালাবী সাহেব... লেখেন, পচিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, যে সমস্ত ব্যক্তি দীনী ইলমে পারদর্শী না হওয়া সত্ত্বেও ‘মুজতাহিদে মুতলাক’ (হওয়ার দাবী করে) এবং ব্যাপকভাবে কোনো ইমামের তাকলীদ করে না। পরিশেষে এমন ব্যক্তি ইসলামকেই বিদায় জানিয়ে দেয়। কাফের ও মুরতাদ হওয়ার বহু কারণ রয়েছে। কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তিদের দীনহারা হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, ইলম না থাকা সত্ত্বেও কোনো ইমামের অনুসরণ না করা।”

সালাফীদের কিয়াস ও ইখতিলাফ

লা—মাযহাবী ও সালাফীরা ময়দানে এসেছে হাদীস অনূসরণের নামে। এবং ব্যক্তির অনূসরণকে প্রত্যাখ্যান করে। সবধরণের মানুষকে তারা হাদীসের অনূসরণের কথা বলেই দাওয়াত দিয়ে থাকে।

তারা একসময় বলত, হাদীস ধরুন, ইখতিলাফ ছাড়–ন!

আজ হাদীস মানতে গিয়ে তারা পরস্পরে এমন ইখতিলাফ—মতানৈক্য শুরু করেছে, যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করছে। পরস্পরের মাঝে বিভক্তি শুরু হয়েছে অনেক পূর্বেই। এই জন্য সালাফী আলেম আবদুল মুহসিন আলবদর তাদের এমন ইখতিলাফে উদ্বেগ—উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে কিতাব লিখেছেন 'رفقا أهل السنة بأهل السنة'। এমনকি তাদের সকলের নামায আদায়ের পদ্ধতি আর এক রকম নয়। শায়খ আলবানী, (১৪২০হি.) শায়খ বিন বায (১৪২১হি.) ও শায়খ উসাইমিন (১৪২১হি.) তিন জনের নামায আদায়ের পদ্ধতি তিন রকম। স্বয়ং সালাফীদের একজন ড. সাদ ইবনে আবদুল্লাহ তাদের তিন জনের মাঝে সংঘটিত মতানৈক্য তুলে ধরেছেন। এবং ' الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز' নামে একটি কিতাবের রূপ দিয়েছেন। আমরা বক্ষমাণ কিতাবেও তাদের মতানৈক্য সমুহকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। এছাড়া তাদের মাঝে সংঘটিত মতানৈক্য সম্পর্কে আরো জানতে সংশ্লিষ্ট কিতাবসমুহ দেখা যেতে পারে।

তাদের নিজেদের মাঝে ইখতিলাফ আজ গোপন কিছু নয়। এ বিষয়ে তারা নিজেরাই কিতাব লিখেছে। এবং অন্যরাও তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তোমরা যে ইখতিলাফকে নিন্দা করো, আজ সে ইখতিলাফের বেড়াজালে তোমরাই আবদ্ধ। সংশ্লিষ্ট কিতাবটি অধ্যয়ন করলেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা বক্ষ্যমাণ কিতাবের প্রবন্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের ইখতিলাফ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

তারা এক সময় কিয়াসকে মান্য করত না। আর তাদের আলোচনার পরিধিও ছিলো সীমিত পর্যায়ের। পরবর্তীতে তাদের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় নতুন নতুন জটিলতা দেখা দিলে তারাও কিয়াস করতে বাধ্য হয়েছে।

বিশেষকরে 'ফিকহুন নাওয়াযিল' এর ক্ষেত্রে তারা কিয়াস করতে বাধ্য হয়েছে। শব্দ যাই ব্যবহার করা হোক। 'ফিকহুন নাওয়াযিলের ক্ষেত্রে তাদের সমাধান কোনো কোনো কিয়াসের আওতায় পড়ে। সালাফীদের আস্থাভাজন শায়খ বকর আবু যায়েদ আবদুল্লাহ সাহেবের 'ফিকহুন নাওয়াযিল' অধ্যয়ন করে দেখতে পারেন।

হিন্দুস্থানের লা—মাযহাবীদের ফাতাওয়া সংকলন যা 'ফাতাওয়া উলামা হাদীস' নামে ১৪ খণ্ডে মাকতাবা সায়ীদিয়্যা মুলতান থেকে ছেপেছে। এ কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করে তাদের কিয়াসী ফাতাওয়ার একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশদভাবে দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করার ইচ্ছা রয়েছে।

তারা কিয়াসও অবলম্বন করে আবার ইখতিলাফেও জড়ায়, ব্যক্তির ব্যাখ্যাও অনূসরণ করে!

অনেক বিলম্বে হলেও তারা নিজেদের ভুল বুঝতে সক্ষম হয়েছে। আসলে স্বীকৃত পথ ছেড়ে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করলে এমনই পরিণতি হয়ে থাকে।

বর্তমানে সামগ্রিক দৃষ্টিতে 'সালাফিয়্যাত' একটি নতুন মাযহাব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ, মাযহাব কোনো ব্যক্তির নাম নয়, বরং নির্দিষ্ট উসূল ও মাকতাবে ফিকরের নাম। সালাফীরাও নির্দিষ্ট উসূল অনুসরণ করে। হোক তা সঠিক বা ভুল। সুতরাং তারাও মাযহাবী। এ শব্দ তারা ব্যবহার না করলেও কাজ করে সম্পূর্ণ মাযহাবীদের মতই।

[ভূমিকা: কুরআন সুন্নাহর আলোকে আপনার নামায]